উপন্যাস

কেউ তাকে নিয়ে আসেনি

শওকত আলী

বাসা থেকে নীপা সময় থাকতেই বের হয়। হালিমা ম্যাডামের ক্লাস সে মিস করতে চায় না। হাটখোলা থেকে রিকশায় চেপে সোজাসুজি দক্ষিণ দিকে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ। টানা রোড ডিভাইডার বসানো হয়েছে হাটখোলায়। অভয়দাস লেনের মোড় হেঁটে পার হতে হবে। তারপর একই রাস্তার ফুটপাত ধরে দক্ষিণমুখো হাঁটো, একেবারে রাজধানী মার্কেটের গেট পর্যন্ত। তারপর আবার রাস্তা পার হওয়া। বলধা গার্ডেনের মোড়ে গিয়ে তখন রিকশায় চাপা যাবে। তবে ঝামেলা সেখানেই শেষ নয়। টিপু সুলতান রোডে যদি জ্যামে পড়ে, তাহলে তো কথাই নেই, সেদিনের প্রথম ক্লাস করা আর হবে না।

আজ তার ঘাড়ের ব্যাগে বোঝা একটু বেশি। তার মোটা সাইজের ডায়েরিখানা তো রয়েছেই। তার সঙ্গে দু'খানা বই, প্রাইড অ্যান্ড প্রেজুডিস আর আইভানহো- আরও আছে কিছু নোট। বই দু'খানা, আর নোটগুলো এনেছিলো ধার করে, বান্ধবী সীমার কাছ থেকে। নোটগুলো কপি করা হয়েছে। কিন্তু বই দু'খানা পড়া হলো না। তার আগেই তাগিদের পর তাগিদ দিতে শুরু করে দিয়েছে সীমা। অগত্যা ফেরত দিতে হচ্ছে। ঘাড়ের ব্যাগটা আজ বেশ ভারী লাগছে। ঐ অবস্থায় খুবই ব্যস্ত হাটখোলা রোডের মোড়ে বেশ কয়েক মিনিট দাঁড়াতে হলো ট্রাফিক সিগন্যালের জন্য। সিগন্যাল উঠলে রাস্তা পার হয়ে উল্টো দিকের ফুটপাত ধরে হাঁটলো রাজধানী মার্কেটের গেট পর্যন্ত। ওখানে আবার রাস্তা। একটানা গাড়ি-বাস-ট্রাক খালি এসেই যাচ্ছে। ট্রাফিক পুলিশ আছে দু'তিনজন, কিন্তু তারা সিগ্রেট ফুঁকতে ফুঁকতে খোশ গল্পে ব্যস্ত। অগত্যা পথচারীদের চলন্ত বাসে ট্যাক্সি আর ট্রাক-প্রাইভেটের ফাঁক গলে রাস্তা পার হতে হয়। নীপাও তাই করে। শেষে বলধা গার্ডেনের মুখে খালি রিকশা পেয়ে তাতে চেপে বসে। বলে, চলো, জগন্নাথ কলেজ।

তার তখন দেরি সইছে না। হালিমা ম্যাডামের ক্লাস, তাঁর ক্লাস মিস করলে গোটা পেপারটাই ভালো করে তৈরি করা যাবে না। গত ক্লাসে যেভাবে ইংলিশ নভেলের ভূমিকা ফাঁদলেন তাতে মনে হয়েছে ম্যাডামের ক্লাসের আগে টেক্সটগুলো পড়ে নিলেই হবে, নোট মুখস্থ করতে হবে না। ম্যাডাম বলেন এমন সুন্দর করে যে, তাঁর কথা মনের মধ্যে গেঁথে যায়। গত ক্লাসে যেমন বললেন, ফিল্ডিং-এর পর মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট হলেন জেন অস্টেন আর ওয়াল্টার স্কট- জেন অস্টেন-এর লেখায় পাওয়া যাবে ইন্টাররিলেশন বিটুইন ইনডিভিজুয়াল অ্যান্ড ফ্যামিলি, অ্যান্ড সোসাইটি অ্যাজওয়েল আর স্কটে পাওয়া যাবে ইনডিভিজুয়াল, নেচার, অ্যান্ড হিস্ট্রি, উইথ ট্রাডিশন। দু'জনে সমসাময়িক তবে অস্টেন বেঁচেছেন মাত্র ৪২ কি ৪৩ বছর। কিন্তু স্কটের ছিল লং লাইফ, প্রায় ৬২ বছরের বেশি। একই সময়ে অমন জিনিয়াস রাইটারের আবির্ভাব অন্য সাহিত্যে দেখা যায় না।

হালিমা ম্যাডামের কথা স্মরণে ঐ মুহূর্তে বাধা পড়ে। তার রিকশা সামনের রিকশার সঙ্গে ধাক্কা খায়। নীপা গলা বাড়িয়ে দেখে, লম্বা সারি- রিকশা, ভ্যান, ঠেলা, বেবি, কার, এমনকি একখানা মালবোঝাই ট্রাকও। তার বুকের ভেতর থেকে হতাশার লম্বা নিঃশ্বাস বের হয়- তার মানে হালিমা ম্যাডামের ক্লাস বোধহয় করতে পারবে না। কব্জি ঘুরিয়ে ঘড়ির দিকে তাকালে দেখে, মাত্র কুড়ি-বাইশ মিনিট হাতে আছে- এই সময়ের মধ্যে টিপু সুলতান রোড পুরোটা পার হয়ে নবাবপুর ধরে, তারপর কোর্ট-কাছারি এলাকা। ওখানেও জ্যাম থাকে। তারপর না বাহাদুর শাহ পার্ক আর কলেজ গেট। সে আপন মনে মাথা নাড়ায় আর উত্তেজনায় ঘামে।

এ মুহূর্তে হালিমা ম্যাডামের সুন্দর চশমা পরা গম্ভীর মুখখানা বারবার স্মরণ হয়। রোলকল চলতে থাকার সময় কেউ ক্লাসে ঢুকলে বিরক্ত হন না, এমনকি চোখ তুলে তাকানও না- কারণ তাঁর বলে দেওয়া আছে যে রোলকল করার সময় ক্লাসে ঢোকার অনুমতি চাওয়ার দরকার নেই। কিন্তু টেবিলের ওপর দু'হাত রেখে যখন লেকচার শুরু করেন, তখন আর কাউকে ক্লাসে ঢুকতে দেন না। কেউ ঢুকলে তাকে ক্লাস থেকে বের করে দেন।

নীপার স্মরণ হয়, সামিনাকে একদিন আর কায়সারকে দু'দিন বের করে দিয়েছেন। অথচ সবাই জানে ওরা ছাত্র হিসেবে খুবই ভালো।

অমন কড়াকড়ি করার জন্য কেউ কিছু বললে তাতে মোটেও কান দেন না। যদি কেউ ওই ব্যাপার নিয়ে বাড়াবাড়ি করে তো, খোলাখুলি জানিয়ে দেন যে টিউটোরিয়ালের নম্বরের কথা ভেবে যেন কথা বলে সে। আজ সে সকাল থেকেই মনে মনে তৈরি হচ্ছে। এমনিতে কোনো অসুবিধা হয়নি। রাতেরবেলা স্যার আইফর ইভান্স-এর এ শর্ট হিস্ট্রি অব ইংলিশ লিটারেচার বইখানার নভেল চ্যাপ্টারটার ওপর চোখ বুলিয়েছে। বাবার ঘর থেকে কোনো সাড়াশব্দ আসেনি, তার মানে বাবার ভালো ঘুম হয়েছে। অবশ্য ভোর সকালেই ঘুম ভেঙেছে তার। ক্র্যাচে ভর করে বারান্দায় দাঁড়িয়েছেন কিছুক্ষণ। বাথরুম থেকে তাঁর মুখ ধোয়ার আওয়াজ দিব্যি কানে এসেছে। তপনকে ঘুম থেকে জাগাবার জন্য ডাকাডাকিও করেছেন। সবকিছু ঠিক ছিলো।

কিন্তু সমস্যা দেখা গেলো খানিক পরই। কাজের মেয়ে মানুষটি আর আসে না। সাতটা বেজে যায় তবু পাত্তা নেই। নাস্তার ব্যবস্থা কী হবে যদি না আসে?

অগত্যা তপনকে পাউরুটি আনতে পাঠানো হয়। বাবার আবার ডিম, মাংস, দুধ খাওয়া নিষেধ। ফ্রিজ থেকে বাসি নিরামিষের তরকারি বের করে গরম করে। আর তাই দিয়ে নাস্তা তৈরি হয়। আর তার সঙ্গে চা- শুধুই লিকার। কঠিন কিছু না, বাবাকে ভাইকে নাস্তা দিয়ে নিজেও খেয়েছে আর অস্থির হয়ে থাকতে হয়েছে, যদি মালেকের মা না আসে, তাহলে দুপুরের রান্নাবান্নার কী হবে!

অবশেষে আসে কাজের মানুষটি। তখন সাড়ে আটটারও বেশি বেজে গেছে। তৈরি হতে হতে নটারও বেশি বাজলো। কারণ সীমার নোটগুলো এলেমেলো হয়ে ছিলো। সেগুলো গোছাতে সময় লাগলো। তারপর আইভান হো খানা পায় না। গেলো কোথায়। খোঁজ খোঁজ- বাবার ঘরে নেই। তপন তখন কোচিং-এ গেছে- ও নিয়েছে কিনা তখন জানার উপায় নেই। খুঁজতে খুঁজতে শেষে ওর বিছানায় বালিশের তলায় পাওয়া গেলো বইখানা। তাই বেরুতে বেরুতে সাড়ে নয়টারও বেশি বেজে গেলো।

তবু বেরুতে যে পারলো তাই ভাগ্যি। বাড়ির কথা ভেবে কোনো চিন্তা হচ্ছে না আজ। তপনকে সে হাসি মুখেই কোচিং-এ যেতে দেখেছে, বাবাও হাসছিলেন যখন সে বাড়ি থেকে বের হয়। আসবার সময় রান্নাঘরে জিনিসপত্রও দেখে এসেছে, সবই ঠিক আছে। বাড়ির চিন্তা মনে জাগছে না। এখন খালি একটাই চিন্তা, হালিমা ম্যাডামের ক্লাসটা ধরতে পারবে কি না। যদি না ধরতে পারে, তাহলে দিনটাই মাটি। টিফিনের পরে মাহবুব স্যারের ক্লাস মডার্ন পোয়েট্রি পড়াবেন- ওই স্যারের লেকচার সে বুঝতে পারে না। সিলেবাসের বাইরে চলে যান লেকচার দেয়ার সময়। সে বুঝে নিয়েছে। ওসব বোঝার দরকার নেই তার। ওসব মুখস্থ করতে হবে।

তবে মাহবুব স্যারের ক্লাসটা নাও করতে পারে। কারণ অফিসে আজ তাকে বেশিক্ষণ থাকতে হতে পারে, সাজেদা আপা গতকালই বলে দিয়েছেন। তো যাবে সে, কোনো অসুবিধা নেই। দুপুরে দোকান থেকে কিছু খেয়ে নিলেই হবে। এমন রুটিনে তাকে প্রত্যেক দিনই চলতে হয়- সুতরাং অভ্যাসের মতো হয়ে গেছে।

কলেজের গেটে যখন রিকশা থামলো তখন ক্লাস আরম্ভের মোটেও দেরি নেই। গেট দিয়ে ঢোকার সময়ই তার খটকা লাগে, আজ চারদিকে ফাঁকা ফাঁকা লাগছে কেন? ডাইনে-বাঁয়ে তাকিয়ে দেখে। ছাত্রছাত্রী যে নেই তা নয়- কিন্তু এতো কম তো থাকার কথা নয়। ১০টা ১১টা নাগাদ তো পুরো ক্যাম্পাসটা মেলার মতো দেখায়। ভাস্কর রাসা'র কাজটা যেখানে সেই বেদীর সামনে-পেছনে ঠাসাঠাসি হয়ে বসে ছেলেমেয়েরা, আজ বেদীটা ফাঁকা- বোরখা পরা মেয়েদেরও ছেলেদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গলা উঁচিয়ে কথা বলতে দেখা যায়, আজ একজনকেও দেখছে না। সে মনে মনে অবাক হয়। হলোটা কী?

চারদিকে দেখতে দেখতে আর প্রায় ছুটতে ছুটতে তিনতলায় গিয়ে ওঠে। ক্লাসরুমে ঢুকে দেখে রুম ফাঁকা, ৪/৫ জন ছেলেমেয়ে হালকা ভঙ্গিতে

আলাপ করছে। কী ব্যাপার, ক্লাস হবে না? তার মুখ দিয়ে আপনা থেকে প্রশ্ন বেরিয়ে যায়।

হাবিব জানায়, না, ম্যাডাম আজ আসবেন না, ছুটি নিয়েছেন, ডিপার্টমেন্টের নোটিশ বোর্ডে দেখে এলাম- ওখানে একটু আগে নোটিশ সেঁটে দেওয়া হয়েছে।

কেন? অসুখ? নীপা হাঁফাতে হাঁফাতে বলে।

জানি না। নোটিশে ওসব কিছু লেখা নেই, শুধু লেখা আছে ম্যাডাম ছুটি নিয়েছে। আজ ক্লাস হবে না। পরশুদিনও না- আগামীকাল তাঁর এমনিতেই অফ ডে।

সে কি। সামিনা অবাক হয়ে বলে, পরশুর পরের দিন তো শুক্রবার, এমনিতেই ছুটি।

তার মানে, ম্যাডাম চালাকিটা ভালোই করলেন, হাবিব মন্তব্য করে?

চালাকি? কী রকম? নীপা ঠিক বুঝতে পারে না।

আরে বুঝলি না! হাবিব ব্যাখ্যা করে। বলে, আজ মঙ্গলবার ছুটি নিয়েছে। কাল বুধবার তাঁর অফ ডে, বৃহস্পতিবার ছুটি নিয়েছেন। তার পরদিন শুক্রবার। এখন হিসাব করে দ্যাখ ছুটি নিলেন দু'দিনের কিন্তু আসবেন না চারদিন। এটা চালাকি নয় তো কী!

বাহ্ চালাকি কেন হবে, নীপা প্রতিবাদ করে। এমার্জেন্সি কিছু থাকতে পারে না?

একটু পরই সীমার সঙ্গে দেখা হয়। সে নীপাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছিলো। অবাক হয়ে বললো, তুই এখানে? আর আমি তোকে সারা ক্যাম্পাসে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

বাহ্! সারা ক্যাম্পাসে খুঁজবি কেন? মিতুল ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করে।

একবার হিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টে গেলাম। একবার গেলাম বাংলায়। তারপর আমাদের ডিপার্টমেন্ট হয়ে এখানে এলাম! এতে কি সারা ক্যাম্পাসে খোঁজা হলো না!

কিন্তু কেন, আমার তো সোজাসুজি ক্লাসে আসার কথা, তাই এসেছিও। তুই কেন গরু খোঁজা খুঁজে বেড়ালি। তাহলে বল তুই ক্লাসে আসিসনি। গরু খুঁজতে এসেছিস।

নীপার কথা শুনে সবাই হেসে ওঠে। বলে, তাহলে তুই গরু, স্বীকার করছিস?

তিন ছাত্রী হাসতে হাসতে একদিকে চলে যায় আর দুই ছাত্রহাবিব আর মাসুম অন্যদিকে আলাপে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

তবে বেশিক্ষণ আলাপ করতে পারে না। তাদের ক্লাসের সময় শেষ- এখন অন্য ইয়ারের ছেলেমেয়েরা ক্লাস করতে আসবে। দু-একজন দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের পরের পিরিয়ড অফ। এখন তারা যায় কোথায়? মেয়েদের জন্য কমন রুম বলে একটা জায়গা আছে বটে, কিন্তু সেটা এতো দূরে যে সিঁড়ি ভেঙে যেতে ইচ্ছে করে না। সীমা বলে, চল তাহলে গাছতলায় গিয়ে বসি।

নীপার ইচ্ছে করে না। সে বলে, তোরা যা, আমি বরং সেমিনারে গিয়ে বসি, কিছু কবিতা, কোলারিজ-এর কথা স্যার এতো বলেন, কিন্তু বুঝতে পারি না।

সেমিনারের দিকে পা বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে তার ঘাড়ের ব্যাগটার কথা মনে পড়ে। আর তাই তাকে ফিরতে হয়। বান্ধবীরা তখন সিঁড়ির মুখে। সে ছুটে গিয়ে সীমাকে ধরে। তারপর নিজের ব্যাগ খুলে বই আর নোটের ফাইলটা সীমার ব্যাগে ভরে দিয়ে বলে, যা এবার। ব্যস ঐ দুটি শব্দ উচ্চারণ করে সেমিনারের দিকে ছোটে।

কিন্তু লাভ হয় না। দেখে ডিপার্টমেন্টের সেমিনারের দরজায় তালা ঝুলছে। কী ব্যাপার? সেমিনার বন্ধ কেন। সেমিনারের বেয়ারা বলে, চেয়ারম্যান স্যারে কইছে, গোলমাল হইতে পারে- সেমিনার য্যান না খুলা হয়।

ঐ কথা শোনার পর আবার ফিরে সিঁড়ি বেয়ে নামতে হয়। আর্টস বিল্ডিং-এর মাঠটা খুব বড় নয়, কিন্তু আবার ছোটও নয়, যদি মাঝখানে গাছটা আর তার চারদিকে ঘিরে বসার বেদীটা না থাকতো তাহলে দিব্যি খেলার মাঠ হতে পারতো। মাঠটা ঘাসে ঢাকা থাকে। কিন্তু এখন চৈত্র মাস, জায়গায় জায়গায় ঘাস নেই, শুকনো বেলে মাটি গা উদ্যেম করে রেখেছে।

নীপাকে আসতে দেখে দুই সখী উঠে দাঁড়ায়। বলে, এখানে বসা ঠিক হবে না, আজ নাকি দুই দলেরই সমাবেশ হবে- দেখ না, সবাই বেরিয়ে যাচ্ছে।

বলতে বলতে সামিনা ঘুরে ঘুরে ডাইনে-বাঁয়ে তাকায়। ঐ সময় মিতুল এসে আবার ওদের সঙ্গে ভেড়ে। সামিনাকে ডাইনে-বাঁয়ে তাকাতে দেখে বলে, কীরে, কাকে খুঁজছিস।

নাহ্ কাকে খুঁজবো। সামিনা জবাব দেয়। বলে, গোলমাল মনে হচ্ছে সত্যি সত্যি হবে- গতকালও তো একদল মিছিল করেছে। কিন্তু ক্যাম্পাসে ছেলেমেয়ে কি কম ছিলো?

সীমা বলে, চল এখান থেকে বের হই। এখানে থাকা ঠিক না।

প্রস্তাবটা মিতুলের মুখ দিয়ে বের হয়। বলে, চল গেটের দিকে যাই, ওখানে কিছু খেয়ে আসি।

গেটের দিকে কয়েক পা এগোতেই স্লোগান ভেঙে আসে। আর তা শুনে অদূরের একটি ছেলে চিৎকার করে ওঠে। আইছে রে, আইয়া পড়ছে-

অন্য আর একজন রাস্তা থেকে চিৎকার করে জানতে চায়, আমাগো অরা কই। আহে নাই এহনও? ক্যান দেরি করে?

গেটের কাছে দেখতে পায় জটলা মতো- ওখানে শুনতে পায় বলাবলি হচ্ছে, আজ দু'দলেরই সমাবেশ ডাকা হয়েছে দুপুর একটার সময়।

ঐ সব কথা শুনে সীমা বলে ওঠে, আমাদের ডিপার্টমেন্টের ছেলেরা কোনো কাজের নয় বুঝলি? একটু চোখ-কান খোলা রাখতে পারে না? এতো বড় একটা কান্ড ঘটতে যাচ্ছে অথচ কোনো খবরই রাখে না? সকালেই ফাইনাল ইয়ারের শামীম ভাইয়ের সঙ্গে টেলিফোনে কথা হলো। কিন্তু কিছুই বললো না!

নীপা চিন্তায় পড়ে যায়। ক্লাস যে হবে না, তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু এখন সে কোথায় যাবে? বিকেল তিনটার আগে তার অফিস খোলে না। সাপ্তাহিক কাগজ। প্রায় সবাই ওখানে পার্টটাইমার- আসে চারটা-পাঁচটার দিকে। এডিটর সাজেদা আপা আসেন তিনটার পরে। আর চারটার দিকে সে যায়, ক্লাস-ট্রাস শেষ করে- আজ নতুন একটা অ্যাসাইনমেন্টের ব্যাপারে আলাপ করবেন সেই জন্য আগে যেতে বলেছেন, তিনটার পরে। এখন গেলে কি অফিস খোলা পাবে? নাকি বাড়ি চলে যাবে! কিন্তু বাড়ি গেলে যদি তিনটার সময় অফিসে না পৌঁছাতে পারে?

ঐ সময় একটি ছেলে চিৎকার করতে করতে আসে। আর বলে, দুইখান বাস ভাঙছে, একখান ট্যাক্সি ক্যাব। হুঁশিয়ার সবাই হুঁশিয়ার, জঙ্গি মিছিল আইতাছে।

ঐ চিৎকার শুনে মিতুল আর সামিনা অস্থির গলায় বলে, এবার তাহলে যাই আমরা?

নীপা বলে, তোরা যাবি? কিন্তু কোন দিক দিয়ে? গেটেই তো গোলমাল!

দেখি, মিতুল বলে, পেছনের গেট দিয়ে বেরিয়ে সদরঘাটের মোড় পার হয়ে বাংলাবাজারের রাস্তায় চলে যাবো, ওদিককার গলি-টলি আমার ছোটবেলা থেকে চেনা। বাংলাবাজার স্কুলে পড়েছি- তোরা যাবি না?

হ্যাঁ যাবো, সীমাকে চিন্তিত দেখায়। বলে, আমি তো যাবো পুরানা পল্টন, এখন সামনের গেট দিয়ে তো বেরুনো যাবে না।

গেট দিয়ে বেরুবার কী দরকার, সামিনা বলে, ডান দিক দিয়ে চলে যা কোর্টের দিকে, তারপর নবাবপুরের মোড়ে গেলেই তো নয়াবাজারের রাস্তা পেয়ে যাবি, নীপা তো চেনে, ওকেও তো ওদিক দিয়েই বেরুতে হবে।

কিন্তু আমি তো ওর সঙ্গে পুরোটা রাস্তা যেতে পারবো না, আমাকে যে অফিসে যেতে হবে।

অফিস? কিসের অফিস? সামিনা মুখ খিঁচিয়ে ওঠে। বলে, তোর ঐ সাপ্তাহিক মহিলা? এদিকে জান নিয়ে টানটানি, উনি আছেন ওনার অফিসের চিন্তা নিয়ে।

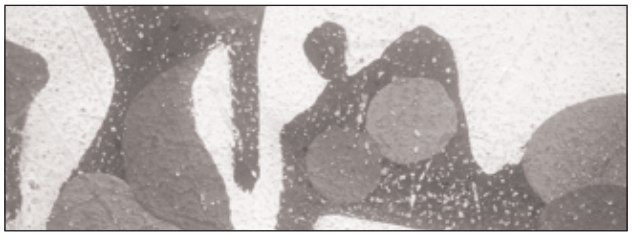

সামিনার কথা শেষ হওয়ার আগেই, পুলিশের বাঁশির আওয়াজ শোনা গেলো। গেটের সামনে যারা ভিড় করেছিলো, তারা ছুটতে ছুটতে ছাত্রছাত্রীরা ভেতরে ঢুকে পড়লো। ফাঁকা গুলির আওয়াজও হলো কয়েকবার, পুলিশের বুটের আওয়াজও কম শোনা গেলো না। স্লোগান, চিৎকার সব কিছু বন্ধ।

বন্ধ গেটের ভেতরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হলো সবাইকে। প্রায় ঘন্টাখানেকের মতো।

শেষে গেট খোলা হলো; তারপর একজন-দু'জন করে বেরুতে লাগলো।

মেয়েদের কিন্তু বেরুতে দেওয়া হলো না। গেটের কাছে দাঁড়ানো পুলিশ অফিসারটি বললো, মেয়েরা একটু পরে বের হবেন, সবকিছু এখনো ক্লিয়ার হয়নি।

অগত্যা আবার অপেক্ষা।

পুলিশ অফিসারটি আসলেই খুব ভালো। তার হুকুমে দু'খানা রিকশা আনানো হলো। তারপর দু'জন করে এক এক রিকশায় উঠে তারা কলেজের গেট দিয়ে বেরুলো।

নীপার রিকশায় সীমা। সে নিজেই বললো, চল তোর অফিসে গিয়ে বসি কিছুক্ষণ। ভয়ে আমার বুক ধড়ফড় করছিলো সারাক্ষণ- কেন যে এই জগন্নাথে ভর্তি করালেন আব্বা-

কিছু বলে না নীপা, চুপচাপ শুনে যায়। তার মনে হয়, সীমা এখনও বাচ্চা মেয়েই রয়ে গেছে- নইলে বাবা কেন সরকারি কলেজে ভর্তি করিয়েছেন মেয়েকে তা ঠিকই বুঝতো- প্রাইভেট কলেজে ভর্তি হতে কতো টাকা লাগে, পরীক্ষার ফি কতো লাগে, বেতন কতো- ওসবের নিশ্চয়ই কিছু জানে না সীমা, জানলে অমন আক্ষেপ করতো না।

অফিস তখন সদ্য খোলা হয়েছে। দু'জনের পেটেই প্রচন্ড খিদে। সীমাই বলে, এখানে কাছাকাছি কোনো দোকান নেই? খুব খিদে লেগেছে।

নীপার মায়া লাগে বান্ধবীর চেহারা দেখে। খিদে তারও লেগেছে, তবু সে হাসে। বলে, দোকান আছে কাছেই, সিঙ্গাড়া পাওয়া যাবে, খাবি?

আনতে বল না-

একটা সিঙ্গাড়া আর চা পাবি, তাতে চলবে?

কেন? একটা কেন? সীমা বুঝতে পারে না।

একটা এই কারণে যে, তার বেশি পয়সা আমার কাছে নেই।

বান্ধবীর কথা শুনে সীমা অপ্রস্তুত হয়ে যায়। বলে, তোর কাছে নেই তো কী হয়েছে, আমার কাছে আছে- আমি দিচ্ছি, সিঙ্গাড়া আর মিষ্টি আনুক।

খেতে খেতেই সীমা বলে, কতোদিন হলো তোর এখানে?

তা হলো, প্রায় বছরখানেক তো বটেই।

এ-ক বছর! বলিস কি? অন্য কোনো কাগজে চেষ্টা করিসনি? তুই তো খুব ভালো ইংরেজি লিখতে পারিস-

ভালো লিখতে পারলেই হয় না। লোক লাগে-

কেন, তোর সেই বন্ধু? সে কিছু করতে পারে না?

কোন বন্ধু, কার কথা বলছিস? নীপা ঠিক বুঝতে পারে না।

আরে সেই যে, ডেইলি হরাইজেন-এর রিপোর্টার। মিতুলের কী রকম যেন কাজিন হয়। কলেজ থেকে ডেকে নিয়ে যায় তোকে। আর সদরঘাটে নদীর ধারে বেদে-বেদেনীদের আস্তানায় ঘুরে বেড়ায়- মিতুল তো বলে, তোর সঙ্গে নাকি ওর অ্যাফেয়ার আরম্ভ হয়ে গেছে-

বলতে বলতে নীপার চোখের দিকে তাকায় সীমা আর হাসে। ওকে বলিস না কেন, ও-ই তো একটা কাজ জুটিয়ে দিতে পারে।

নীপা হাসে না, বরং একটু অবাক হয়। কিছুক্ষণ আগে কী রকম ঝামেলার মধ্যে পড়তে হয়েছিলো, অথচ তার কোনো প্রতিক্রিয়া নেই মেয়েটার কথাবার্তায়? সে বলে, হ্যাঁ বলবো ওকে, কাজ জুটিয়ে দেয়ার জন্য- কিন্তু তুই মিতুলকে জিজ্ঞেস করিস তো, আমার চাকরির জন্য ও চেষ্টা করলে মিতুল জেলাস হয়ে পড়বে কি না!

সীমা অবাক হয়ে বলে, এ তুই কী বলছিস? মিতুল নিজেই-

নপিা এবার হাসে। বলে, আমি আর কী বলবো, তুই নিজে জিজ্ঞেস করিস, তাহলেই বুঝবি।

ঐ রকম কথার মধ্যেই সিঙ্গাড়া মিষ্টি খাওয়া শেষ হয়- তার পরে চা-ও। নীপা বলে, আমি তাহলে উঠি এখন- আজ যা ধকল গেলো!

আচ্ছা। হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ার মতো ভঙ্গিতে সে আবার বলে, ছেলেটার, মানে ঐ জার্নালিস্টের আসল নামটা যেন কী, বললি?

কেন? নীপার মুখে বাঁকা হাসি দেখা যায়। বলে, মিতুল তোকে বলেনি?

না, ও তো খালি জিপু ভাই জিপু ভাই করে, ওরা কোথাকার লোক, তুই কিছু জানিস?

হ্যাঁ, জানি, নীপা বলে। জানায় ওর পুরো নাম সৈয়দ আজফার হুসেইন- হোসেন না, হুসেইন- বুঝলি কিছু? ওরা অরিজিনালি ইন্ডিয়ার লোক। ওর দাদা মোক্তার ছিলেন- মোক্তার মানে জানিস? লোয়ার কোর্টের ল'ইয়ার- ওর বাবাকে '৭১-এ পাকিস্তানি আর্মি টর্চার করে হাত-পা ভেঙে দেয়- আরও শুনবি?

সীমা মাথা নাড়ায়। বলে, না ভাই, আর শুনতে চাই না- এবার আমি যাই।

সীমা চলে গেলে নীপা ফাইল নিয়ে বসে। দু'সপ্তাহ আগে নিজের বেদে আর বেদেনীদের ওপর লেখা রিপোর্টিংটার ওপর চোখ বুলায়। এই রিপোর্টিংটার জন্যই সাজেদা আপা আজকাল তাকে খুব পাত্তা দিচ্ছেন- আর এটা পড়েই আজফার এসে তার সঙ্গে অফিসে দেখা করে, তারপর কলেজে গিয়েও তার সঙ্গে কথা বলে, সদরঘাটে যায়, তারপর নদীর ওপারেও গেছে কয়েকদিন- ছেলেটার সব ভালো, কিন্তু গায়ে-পড়া ভাবটা ভালো লাগে না নীপার।

সে এলোমেলো চিন্তা করে আর অপেক্ষা করে, সাজেদা আপা কখন আসেন। বলেছিলেন তিনটার পর আসবেন। দেয়াল ঘড়ির দিকে নজর দিলে দেখে প্রায় চারটা বাজতে চলেছে- ওদিকে অফিসের কাজ থেমে নেই- প্রেস থেকে লোক এসে ম্যাটার নিয়ে গেলো। তার এক সহকর্মী মজিদ সাহেব, দৈনিক ঘেঁটে সারা সপ্তাহের প্রধান খবরগুলো নিয়ে একটা স্টোরি তৈরি করে মাধুরীদি'র হাতে দিয়ে চলে গেলেন, তার নাকি আজ ইভিনিং ডিউটি। একটু পর প্রায় পাঁচটার দিকে মোমেনালি এসে খবর দিলো যে সাজেদা আপা আজ আর আসবেন না। নীপার সঙ্গে আগামীকাল বিকেলে কথা বলবেন।

মোমেনালিই খবর দিলো যে কলেজে ভয়ানক গোলমাল হয়েছে, দুই দলের মধ্যে গোলাগুলি চলেছে, বহু জখম, দু'জনের অবস্থা খুব সিরিয়াস।

আপনে আগে আইয়া পড়ছেন, ভালো করছেন- নাইলে কী হইতে কী হইতো আল্লাহ জানে।

অফিস থেকে বেরুতে যাবে, ঐ সময় দেখে আজফার আসছে। তাকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে শোনা যায়। বলে, যাক, আপনি তাহলে এখানেই।

কেন, আর কোথায় যাবো? নীপা চোখে চোখে তাকায়।

আজফার হেসে ওঠে। বলে, যাবার জায়গার কি অভাব আছে? কতোজন কতো জায়গায় চলে যাচ্ছে- আজ তো কয়েকজন হাসপাতালে চলে গেছে শুনলাম।

হ্যাঁ। নীপা শান্ত গলায় বলে, খুব খারাপ খবর, তা আপনি এদিকে?

বাহ্ কী প্রশ্ন? আজফারের গলার স্বরে কপট বিদ্রূপ ফোটে। বলে, নিজেরা খবর তৈরি করে বসে আছেন আর সাংবাদিককে জিজ্ঞেস করছেন, এদিকে কোথায়?

নীপা বলে, আমরা যখন বেরিয়েছি তখন দৌড়াদৌড়ি হয়েছে, পুলিশের রাইফেলের ফাঁকা আওয়াজও শুনেছি। কিছু সময়ের জন্য শান্ত হয়েছিলো ঐ সময় পুলিশের সাহায্যে আমরা বেরিয়ে পড়ি- আসল গোলাগুলি চলেছে শুনলাম তার অনেক পরে।

এতো তাড়াতাড়ি ছুটি? আজফার কৌতূহলী হয়?

হ্যাঁ, কাজ শেষ হয়ে গেলে বসে কেন থাকবো?

আমি এসেছিলাম কলেজেই আজফার জানায়। বলে, প্রেসক্লাবে গোলাগুলির খবরটা পাই, টেলিফোনে, চিফ রিপোর্টার জানান- তাঁর কথা শুনে ছুটতে ছুটতে আসি- এসে দেখি গোটা এলাকা খাঁখাঁ করছে মানুষজন প্রায় নেই বললেই চলে। কয়েকজন পুলিশ শুধু রাইফেল হাতে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে ওদের কাছ থেকেই শুনলাম, যে কয়েকজন বেশ সিরিয়াসলি জখম হয়েছে- ওদের ঢাকা মেডিকেলে পাঠানো হয়েছে। দু'জনকে নাকি অপারেশন থিয়েটারে নেওয়া হয়েছে- বুঝলাম নিশ্চয়ই সরকারি দলের ছাত্র হবে। কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করার পর মনে হলো যে আপনার খবর নিয়ে যাই, তাই চলে এলাম।

নীপা কথা শুনতে শুনতে আজফারের ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করে। আর তাতে মনে হয়, ও যেন কারোর কাছে কৈফিয়ত দিতে শুরু করেছে। সে বলে, তাহলে কি অফিসে বসবেন? চলুন ভেতরে গিয়ে বসি।

নাহ্ থাক। আজফার অপ্রস্তুত হয়ে বলে, অন্য দিন হবে, সেদিন এসেই চ-টা সব খেয়ে যাবো।

দু'জনে অফিসের গেট দিয়ে বেরিয়ে রাস্তায় পাশাপাশি হাঁটে কিছুক্ষণ। হাঁটতে হাঁটতেই আজফার এক সময় হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, আপনাদের দেশের বাড়ি যশোর, তাই না? আপনার আব্বা স্কুল টিচার ছিলেন ওখানে।

না, ওখানে না, এখানেই ছিলেন- এখনো শিক্ষকতা করেন। তবে বাড়িতে- তাছাড়া আমার মাও স্কুলে কাজ করতেন।

হ্যাঁ, ঐ রকম খবর পেয়েছি আমি- আপনি তো একবারও বলেননি যে আপনারা কোথাকার লোক বা আপনার বাবা কী করেন- শুধু এইটুকু জানিয়েছেন যে, আপনার মা নেই- শেষে আমাদের অফিসের এক সিনিয়র প্রুফরিডার কথায় কথায় আপনাদের কথা বললেন- যশোরে বাড়ি ভদ্রলোকের- নাম সুবোধ সরকার, চেনেন?

নীপা মাথা নাড়ায়। বলে, না চিনি না, নামও শুনিনি-

রাস্তার মোড়ে দু'জনে দাঁড়ায়- এখান থেকেই রিকশা নিতে হবে। ভদ্রলোক আর কিছু বলেননি? নীপা আড়চোখে আজফারের মুখের দিকে তাকায়।

ঐ সময় একখানা রিকশা আসে আর সেটাকে আজফার হাত তুলে থামায়। তারপর বলে, যান রিকশায় উঠুন- এখন বাড়ি যাবেন তো, নাকি অন্য কোথাও?

না বাড়িতেই যাবো আমি, কিন্তু আপনি কোথায় যাবেন? অফিসে? মানে পুরানা পল্টনে, নাকি প্রেসক্লাবে?

বাহ্! প্রেসক্লাবে এখন কেন যাবো? রিপোর্টটা লিখতে হবে না? আজফার হাসতে হাসতে জানায়।

তাহলে তো এক রিকশাতেই যাওয়া যায়, নীপা খুব সহজভাবেই কথাটা বলে।

হ্যাঁ, তা অবশ্যিই যাওয়া যায়।

আজফারের গলায় একটু যেন ইতস্তত ভাব ফোটে। শব্দ ক'টা উচ্চারণ করার সময় সে নীপার চোখের দিকে তাকায়।

নীপা তাগিদ দেয়। বলে, তাহলে দেরি কেন? চলুন রিকশায় উঠি। আজফার নীপার হাত ধরে। বলে, আমার তাহলে একটা শর্ত আছে।

কী শর্ত? নীপা চোখে চোখে তাকায়।

আপনি ভাড়া দিতে পারবেন না। ও, এই কথা। নীপা হেসে ওঠে। বলে, ঠিক আছে আমি ভাড়া দেবো না।

তারপর মন্তব্য করে- কী যে মিডল ক্লাস এটিকেট দেখান আপনারা- এই যুগে- আমি বুঝি না।

দু'জনের রিকশায় ওঠা হলে আজফার জানতে চায়। কথাটা কী বললেন? মিডল ক্লাস কী?

বয়রা নাকি? নীপা আসন সঙ্গীর মুখের দিকে তাকায়। তারপর বলে, আমি বলছিলাম মিডল ক্লাস এটিকেট। কেন শব্দটার মানে বোঝেননি? যাকে বলে গায়ে পড়ে ভদ্দরলোকি ঢঙ দেখানো।

উহু! এবারও বুঝলাম না।

না বোঝার কী আছে, এবার যেন নীপা বিরক্ত হয়। বলে, এটা তো জানা কথা যে, রিকশাখানা হাটখোলা হয়ে মতিঝিল পার হবে। তারপরই তো পুরানা পল্টন- আপনি পলটন পর্যন্ত যাচ্ছেন- আমি মাঝপথে নেমে যাবো। সুতরাং পুরো ভাড়া তো আপনার কাছেই চাইবে রিকশাঅলা- এবং আপনারই ভাড়াটা দেয়ার কথা- ভাড়া না দেয়ার শর্ত জুড়ে দিয়ে আসলে আপনি আমার মনের ওপর বেশ ভালো মতোই ঘা দিয়েছেন।

এসব কী বলছেন আপনি! আজফার দু'চোখ কপালে তোলে। বলে, আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

কেন, আপনার কথায় কি এটা মনে হয় না যে, আপনি আমাকে দয়া দেখাচ্ছেন? আমার রিকশা ভাড়া আপনি দিচ্ছেন।

আহা আমি তো তা মনে করিনি, সরি! প্লিজ মাফ করে দিন!

নীপা হাসে। বলে, আপনি বরং একটা চান্স মিস করলেন। বলতে পারতেন যে দু'জনে এক রিকশায় গেলে আমাদের বাড়িটা আপনার চেনা হয়ে যাবে। তাহলে আপনার কথা শুনে আমি মনে মনে খুব খুশি হতাম। ভাবতাম যে একজন ইয়ং জার্নালিস্ট, তাও আবার দেশের টপ পত্রিকার, আমার বাড়িঘর, ঠিকানা দেখাতে আর জানতে চায়।

রিকশায় বসে সেদিন ঐ রকম কথাবার্তা হয় দু'জনার। নীপা আজফারের সঙ্গে বেশ কয়েক দিন ঘোরাফেরা করেছে। কিন্তু পায়ে হেঁটে, নয়তো নৌকায়, একেবারে গায়ে গা ঘেঁসে বসা এই প্রথম। গায়ে গা লাগলে কেমন বিচিত্র ধরনের অস্বস্তি বোধ হচ্ছে তার। ছেলেদের পাশে বসে রিকশায়-বাসে অনেক চলাফেরা করেছে সে, কিন্তু এমন কেন লাগছে সে বুঝতে পারে না। ওয়ারির রাস্তা শেষে নারায়ণগঞ্জ রোড পার হয়ে রিকশাটা শেরে-বাংলা মহিলা কলেজের গলিতে ঢুকে পড়ে। কিছুটা এগোবার পর বাঁহাতি একটা ছোট গলিতে ঢুকে একটা প্রাচীন শ্যাওলাধরা বাড়ির গেটের সামনে রিকশাটা দাঁড় করিয়ে নীপা নামে, তারপর মুখ ফিরিয়ে একটু হেসে বলে, এটাই আমাদের বাড়ি, ভেতরে আসবেন?

তার কথা বলার ভঙ্গি দেখে আজফার দোটানায় পড়ে যায়। কী করবে বুঝতে পারে না।

পথসঙ্গীর ইতস্তত ভাব দেখে নীপা হাসে। বলে, বাড়িটা বোধহয় পছন্দ হচ্ছে না, তাই না? যাক ইচ্ছে না হলে ভেতরে যাবার দরকার নেই- তাছাড়া এখন আমি চা-টা বানাতে পারবো না- অন্য আর একদিন হবে, নেমন্তন্ন রইলো- কি? রাগ করলেন?

আজফার হ্যাঁ-না কিছুই বলে না, নীপার ভাবভঙ্গি দেখে আর কথা শোনে, আর হাসে।

জানালার পাশে দাঁড়িয়ে থাকার সময় ইমরান মাস্টার মেয়েকে রিকশা থেকে নামতে দেখেছিলেন। মেয়ে বারান্দায় উঠতেই জানতে চাইলেন, কে ছিলো রিকশায়? লোকটা কে?

আছে একজন। নীপা খুব স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে জানায়। বলে, সেই যে আসতো ২ মাস আগে। বেদেনীদের ওপর লেখা আমার স্টোরিটা পড়ার পর ডেইলি হরাইজেন-এর রিপোর্টার- নাম আজফার হোসেন, তোমার মনে নেই? তখন থেকেই দেখা হলে কথাবার্তা হয়- আজ কলেজে দুই ছাত্র গ্রুপের মধ্যে খুব মারামরি হয়েছে- সেই মারামারির খবর নিতে গিয়েছিলো, অফিস থেকে বেরুবার সময় দেখা, রিকশা পাচ্ছিলাম না, তাই এক রিকশায় এলাম আর কী?

মেয়ের মুখ থেকে লম্বা কৈফিয়ত শুনতে শুনতে ইমরান সাহেবের হাসি

পেয়ে যায়। বলেন, তুমি ওকে ভেতরে এনে বসালে না কেন, কিছুক্ষণ আলাপ করতাম?

কী আলাপ করতে? এখন কি ওর সময় আছে? ওকে অফিসে গিয়ে রিপোর্ট লিখতে হবে না? ও আবার আসবে, নীপা বাবাকে আশ্বস্ত করে। বলে, ওরা যশোরের লোক। তোমার নাম জানে বললো- কী যেন বলতে চাইছিলো, ঐ সময় কথার খেই হারিয়ে অন্য কথায় চলে যায়, আর তাতেই কথাটা শোনা হলো না- অবশ্যি পরে আমিও আর জিজ্ঞেস করিনি।

ভালো করেছো, ইমরান বলেন, পাস্ট ইজ পাস্ট- যা ছেড়ে এসেছি তা নিয়ে কেন কথা বলবো আমরা? যদি কখনো পুরনো কথা তোলে তো বলে দিও, ওসব ঘটনার কথা তুমি জানো না- আর জানলেও ওসব নিয়ে তুমি কথা বলতে চাও না।

নীপা খুব ঘেমে গিয়েছিলো। তাই বাবার সঙ্গে কথা না বাড়িয়ে স্নান করার জন্য চলে যায়।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরের মেঝেতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চুল ঝাড়ায় আর বাবার গলা শোনে। বাবা জানতে চান, আজ সকালে তপন কিছু বলেছিলো তোকে?

না তো। কী বলবে? নীপা মাথায় তোয়ালে জড়িয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ায়।

বিকেল ফুরিয়ে এলো অথচ ছেলের কোনো পাত্তা নেই। ইমরান সাহেবের গলার স্বরে একটু যেন উদ্বেগের ভাব প্রকাশ পায়। নীপার হঠাৎ মনে পড়ে। বলে, আজ বুধবার ওর তো কোচিং-এ যাবার কথা, ওদের কলেজেরই ফিজিক্স-এর এক স্যার কোচিং খুলেছেন- কাল রাতে বললো, কলেজ থেকে ও কোচিং-এ যাবে।

আরে সে কথা তো আমাকেও বলে গেছে- পাঁচটার আগেই বাড়িতে ফিরবে। ঘড়ি দেখো। কটা বাজে? কোচিং মানে তো প্রাইভেট টিউশনি। আমি ছেলেদের প্রাইভেট পড়াই না? আমি জানি না একটা সাবজেক্ট পড়াতে কতোক্ষণ সময় লাগতে পারে?

কথাটা উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়। বাবা এসএসসির ছাত্রদের ইংরেজি পড়ান- তার তো এক-দেড় ঘন্টার বেশি সময় লাগে না। দুই ব্যাচে পড়ান, সকালে এক ব্যাচ, আর বিকেলে এক ব্যাচ। দুই ব্যাচেরই ঐ এক সময়সীমা- দেড় ঘন্টার বেশি নয়। তাহলে? তপন কেন ফিরছে না! ইমরান হাসান ক্র্যাচে ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে গেট পর্যন্ত যান। সন্ধ্যার আজান হচ্ছে তখন। নীপা বেরিয়ে এসে বাবার হাত ধরে টানে। বলে, তুমি অতো অস্থির হচ্ছো কেন? ও ঠিক এসে যাবে- বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে বোধহয় কোথাও আড্ডা-ফাড্ডা দিচ্ছে।

না, আমার চিন্তা হচ্ছে মা, ইমরান হাসান মেয়েকে নিজের মনের উদ্বেগের কারণ খুলে বলেন। জানান যে, মতিঝিল এলাকায় দুপুরবেলা ছাত্রদের মিছিল বেরিয়েছিলো, সেই মিছিলের ওপর লাঠিচার্জ করেছে পুলিশ। কয়েকজনকে ধরেও নিয়ে গেছে। এখন চিন্তা হচ্ছে। ইমরান সাহেব বলেন, ওরই মধ্যে পড়লো কি না! ছেলেটা! এখন কোথায় খুঁজবো, হাসপাতালে না থানায়?

না, বাবা না, নীপা বাবাকে বোঝাতে চেষ্টা করে। বলে, খামোখা তুমি চিন্তা করছো, ও নটরডেম কলেজের ছাত্র, ওর সঙ্গে বইখাতার ব্যাগ আছে। ওকে কেন ধরবে পুলিশ? আর হাসপাতালেই বা কেন নিয়ে যাবে- ও তো মিছিল-টিছিল একদম পছন্দ করে না। ও কী বলে শোনোনি? ও বলে, ঔসব মিছিল আর হরতাল হচ্ছে চোর-ছ্যাঁচরদের ঝগড়া আর মারামারি। সব নাকি বখরার জন্য- ও তো মুখের ওপর বলে দিলো এক বন্ধুকে যে, কোনো মিছিলে যাবে না।

দেখতে দেখতে রাত গভীর হতে থাকে। শেষে ইমরান সাহেব ক্র্যাচে ভর দিয়েই বেরুলেন। কাছেই থাকেন তাঁর এক অ্যাডভোকেট বন্ধু, তাঁর কাছে গেলেন। সব শুনে সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট জামাল সাহেব চারদিকে ফোন করা আরম্ভ করলেন। বেশিক্ষণ লাগে না- কিছুক্ষণ পরই খবর পাওয়া যায় যে, কয়েকটি অল্পবয়সী ছেলেকে অ্যারেস্ট করে থানা হাজতে রাখা হয়েছে- তাদের মধ্যে একজনের নাম শাম্‌স ইমরান। ঐ খবর শোনার পর ইমরান হাসান বন্ধুর হাত ধরে প্রায় ভেঙে পড়েন। বলেন, এখন কী হবে ছেলেটার! জামাল, বাই তুমি কিছু একটা করো।

জামাল হোসেন বন্ধুর ঘাড়ে হাত রেখে সান্ত্বনা দিতে দিতে ড্রাইভারকে গাড়ি বের করতে বলেন, তারপর বেরিয়ে পড়েন দু'জনে।

শেষে রাত বারোটার পর বন্ধুর গাড়িতে চেপে ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে ইমরান হাসান বাড়ি ফেরেন। ফেরার সময় গাড়িতে বসেই ছেলে পুরো ঘটনাটা জানায়। আসলে মিছিল-টিছিলের ধারে-কাছে ছিলো না ওরা, মানে ওরা তিনজন একই ক্লাসের একই সেকশনের ছাত্র- ওরা খাওয়া-দাওয়া করতে গিয়েছিলো আরামবাগ মোড়ের এক দোকানে। তিনজন পাশাপাশি হেঁটে যখন ফিরছিলো, তখনই কলেজ গেটের কাছে পেছন থেকে পুলিশের গাড়ি এসে সামনে থামে। তারপর তিনজনকেই টেনে গাড়িতে তুলে থানায় নিয়ে যায়।

অ্যাডভোকেট সাহেব ওসির কাছে জানতে চান, ওদের কী মিছিল থেকে ধরা হয়েছে? নাকি ওরা কোথাও কিছু ভাঙচুর করছিলো?

মিছিলের সময় ধরা হয়েছে ওদের। ওরা ঢিল ছুঁড়ছিলো দোকানের দিকে-

ওরা যে ঢিল ছুঁড়ছিলো বা তাতে দোকানের ক্ষতি হয়েছে এমন প্রমাণ আছে? আরে! গুন্ডাপান্ডাদের ধরলে কি প্রমাণের দরকার হয়?

থানার ওসির কথা শুনে অ্যাডভোকেট সাহেব খোলাখুলি বলেন, দেখুন ওসি সাহেব। এদের জন্য আমি জামিন নিতে এসেছি- একজনের জন্য এসেছিলাম। এখন তিনজনের জন্য চাইছি- কারণ ওদের ধরা হয়েছে কলেজের গেটের কাছে, ওরা যে কলেজের ছাত্র তার প্রমাণ ওদের ঘাড়ের ব্যাগ আর তার ভেতরকার বইখাতা। আর ওরা ঢিল ছোঁড়াছুঁড়ি করে যে কোনো রকম ভাঙচুর করেনি তার প্রমাণ মোড়ের দোকান থেকে কলেজ গেটের দূরত্ব অনেকখানি। তার ওপর ওখানকার কোনো দোকান থেকে ভাঙচুর করার কোনো লিখিত অভিযোগ আপনার কাছে নেই। আমরা খোঁজ নিয়ে এসেছি ঐ মোড়ের কোনো দোকানেই কোনো রকম ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেনি- আপনি কি ওদের এখন জামিন দেবেন? নাকি আমাকে হায়ার অথরিটিকে জানাতে হবে?

তার মানে? আপনি আমাকে শাসাচ্ছেন?

না শাসাচ্ছি না, অ্যাডভোকেট জামাল হাসেন বলেন, কেন শাসাবো বলুন? মাত্রই পনেরো-ষোলো বছরের ছেলে ক'টি। ছাত্র হিসেবেও খুব ভালো- না হলে নটরডেম কলেজে কীভাবে ভর্তি হয় বলুন? ঐ বাচ্চা ছেলে তিনটিকে ক্রিমিনালদের সঙ্গে হাজতে বন্দি করে রাখাটা কি ঠিক হবে? আপনি যদি জামিন না দেন, তাহলে এসপি সাহেবকে জানাতে হবে- তাতেও যদি কাজ না হয় তাহলে আইজি-ডিআইজি আছেন- রাত বারোটা প্রায় বাজে।

ওসি ভদ্রলোক দু'হাত দিয়ে নিজের মাথা ধরে থাকলেন কিছুক্ষণ, তারপর একজনকে হুকুম দিলেন, যাও ছেড়ে দাও ছাত্রদের।

অ্যাডভোকেট সাহেবের দিকে তাকিয়ে তারপর বলেন, আপনি একখানা জামিনের দরখাস্ত দিন- তারপর খাতায় সই করুন যে, আপনার মক্কেলরা রিলিজিড্ হয়ে গেছে।

তপন, মৃদুল, সুজন তিনজনেরই জামিনের আবেদনকারী একজন- তিনি হচ্ছেন জামাল হোসেন। মৃদুল-সুজনের বাড়িতে টেলিফোন করা হয়েছিলো। থানা থেকে বেরুবার আগেই তাদের বাবা-মা'রা এসে পৌঁছে গেলেন- হাত জড়িয়ে ধরে খুব গভীর কৃতজ্ঞতা জানাতে শুরু করলেন একের পর এক। শেষে গাড়িতে ওঠা এবং বাড়ির পথ ধরা।

গাড়িতে ওঠার পর জামাল সাহেব একটু ধমকের মতোই দিলেন তপনকে। বললেন, যেসব জায়গায় মিছিল-মিটিং হয় সেসব জায়গায় কখনো যাবে না। গেলেও চেনা লোকের সঙ্গে যাবে, বুঝেছো?

তপন কোনো রকম সাড়া দেয় না। হুঁ হাঁ কিছুই বলে না, সে তখন পাথরের মতো স্থির। ইমরান হাসান ওদিকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা খুঁজে

পাচ্ছেন না, একেবারে অভিভূত অবস্থা তার। জামাল সাহেবের হাত ধরে রেখেছেন গাড়িতে ওঠার পর থেকে, তারপর আর ছাড়েননি। বলেন, জামাল ভাই, আপনি না এলে ছেলেটাকে কাল সকালে কোর্টে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে তারপর জেলহাজতে পাঠিয়ে দিতো। তারপর যে কী হতো ছেলেটার, আমি কল্পনা করতে পারি না। জেলে যাওয়ার অভিজ্ঞতা তো আমার আছে-

জামাল হোসেন কলেজ জীবনের বিপ্লবী আর সাহসী বন্ধুর মুখ থেকে অমন কৃতজ্ঞতার কথা শুনে ভয়ানক বিব্রত বোধ করেন। বলেন, ওসব বাদ দাও। এখন বাড়ি চলো, তারপর ছেলেটাকে নিয়ে খাওয়া-দাওয়া করো। তারপর ঘুমাও- ওইটুকু ছেলে ওর ওপর দিয়ে কীরকম ধকলটা গেছে একটু চিন্তা করো- খামোকা ইমোশনাল হয়ো না।

ঐ কথা বলার সময় জামাল সাহেবের বোধ হয় পুরনো দিনের কথা স্মরণ হয়, যখন ইমরান, আশরাফ, অরবিন্দ, কাইয়ুমরা সশস্ত্র বিপ্লবের কথা বলতো, আর পুলিশের নজর এড়িয়ে তাদের পার্টির কাজ করতো। জামাল হোসেনও একই সঙ্গে পড়তেন। কিন্তু বিপ্লব-টিপ্লবের পক্ষে কখনো কথা বলেননি। খুব ভালো বক্তা হয়ে উঠেছিলেন। রাজনৈতিক নেতারা জনসভা করার সময় জামালকে ধরে এনে বক্তৃতা দেওয়াতেন।

জামাল হোসেন পুরনো দিনের কথা স্মরণ করতে করতে বলেন, হ্যাঁ ভাই ইমরান। এখন মনে হয়, তোমাদের চিন্তা একেবারে ভুল ছিলো না- মেহনতি আর প্রকৃত যোদ্ধা মানুষের হাতে নেতৃত্ব থাকলে আজ দেশের অবস্থা এমন হতো না।

ইমরান হাসান বন্ধুর কথা ঠিকমতো ধরতে পারেন না। তার মনে তখন অন্য স্মৃতি। যশোর কলেজের বিএ ফাইনালের ছাত্র দু'জনই। তুখোড় বক্তা হয়ে উঠেছিলেন তখন ঐ বয়সেই। ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে যোগাযোগ ছিলো। তবে ঐ সম্পর্ক থাকা পর্যন্তই। কোনোদিন নেতাটেতা হননি, হওয়ার ইচ্ছেও জাগেনি। যুদ্ধ তখনও আরম্ভ হয়নি, নানান রকমের উত্তেজনা চারদিকে। বাম রাজনীতির দিকে একটু ঝোঁক ছিলো, শ্রেণীশত্রু খতম করো স্লোগান যারা পছন্দ করতো তাদের ধারে-কাছে যেতেন না। যারা অমন উগ্র স্লোগান দিতো না, অমন আন্ডারগ্রাউন্ড কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিলো। দেখা হলে বলতেন, আমার ভাই বিশ্বাস হতে চায় না যে ওরা কিছু করতে পারবে। ওরা সংখ্যায় কয়জন? ওদের কাজকর্ম সম্পর্কে যা শুনি, তাতে ভয় লাগে- এখন তো আসল শত্রু ঘাড়ের ওপর। পাকিস্তানিরা। ও ব্যাপারে ফয়সালাটা আগে হওয়া দরকার। ইমরান তখন অনেকটা কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলো বিপ্লবী রাজনীতির। কিছুদিন পরই যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। যশোর ক্যান্টনমেন্টে পাকিস্তানি আর্মি একেবারে কম ছিলো না। অতো কিছু জানার পরও গ্রুপে গ্রুপে মতের অমিল থেকেই গিয়েছিলো। তবু ঐ অবস্থাতেও পাকিস্তানি আর্মির বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিলেন তাঁর সমবয়সীরাই- ওরা অনেকেই বন্ধু ছিলেন জামাল হোসেনের। কমরেড অরবিন্দ দত্ত যেমন সক্রিয় ছিলেন, তেমনি সক্রিয় ছিলেন ইমরান হাসানও- আরও ছিলেন কমরেড কামরান। ওদের বিএ পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশ হওয়ার পরও অনেকে অস্ত্র হাতছাড়া করেনি। তাদের যুক্তি, অস্ত্র কেন হাতছাড়া করবো! শ্রেণীশত্রু তো রয়েই গেছে- বিপ্লবের আসল কাজ তো এখন আরম্ভ হবে। ঐ সময় দুই গ্রুপের মধ্যে গোলাগুলি হয় আর তাতে ইমরানের হাঁটুতে গুলি লাগে। ভাঙা পা নিয়ে তাকে গ্রামের দিকেই তখন থাকতে হচ্ছিলো- কারণ তখন রক্ষীবাহিনীর খুব দাপট। শেষে ভাঙা পা সারাবার ছুতোয় চলে আসে ঢাকা শহরে, বাবার বাড়িতে। সরকারি স্কুলের মাস্টার কামরান সাহেব তখন ঢাকার বাড়িতে। চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। স্ত্রী গত হয়েছেন তার আগে, মেয়েটিও শ্বশুরবাড়িতে। ছেলের ওপর ভীষণ রাগ ছিলো তার। সেই ছেলেকেই যখন জীর্ণশীর্ণ চেহারা নিয়ে দু'হাতে হাঁটু চেপে ধরে সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠতে দেখলেন, তখন আর রাগ মনের মধ্যে ধরে রাখতে পারলেন না।

অল্পক্ষণের পথ- কিন্তু ঐ অল্পক্ষণের মধ্যেই বহু পুরনো কথা ইমরান হাসানের মনে তোলপাড় করে ওঠে। বন্ধুকে অন্যমনস্ক দেখে জামাল হোসেন বলে ওঠেন, কী ভাবছো তুমি অ্যাঁ? ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা হচ্ছে? আরে ভাই চিন্তার কিছু নেই- আরে ও তো আসলেই মিছিলে ছিলো না। একটু ভেবে দেখো, তুমি ঐ বয়সে কী করতে? ছেলে তো ওসবের ধারেকাছে নেই।

তপন গাড়িতে জানালার পাশে বসে প্রায় জনহীন রাজপথ দেখছিলো, আর বোধ হয় নিজের বিপদে পড়া আর বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার কথাই চিন্তা করছিলো।

জামাল হোসেন তার ঘাড়ে হাত রেখে বলেন, কী বাবা, আমার কথা কি মনে থাকবে?

তপন স্থির, কোনোরকম সাড়া দেয় না। তখন আবার বলেন জামাল অ্যাডভোকেট। আচ্ছা, তোমার কি মিছিল-টিছিলে যেতে ইচ্ছে করে?

জি না, তপন জোরে মাথা ঝাঁকায়। বলে, ওসব করলে কি লাভ হয় আমি বুঝি না।

কেন, ওরা কি বলে, শোনোনি?

হ্যাঁ, শুনেছি, তপন চোখে চোখে তাকিয়ে বলে, ওরা বলে- আন্দোলন করলে নাকি মানুষের ভালো হবে। কিন্তু কারও কোনো ভালো হয়েছি কি? কোথাও তো দেখিনি, ওদের কথাবার্তা, কাজকর্ম সব আমার কাছে মিনিংলেজ মনে হয়।

রমনা থানা থেকে ওয়ারী আর কতোটুকু রাস্তা। তাও আবার মধ্যরাতে। গাড়িতে চেপে। আধঘন্টা সময়ও লাগেনি। গেটের কাছে গাড়ি থামলে ইমরান হাসান ছেলের ঘাড়ে ভর করে গাড়ি থেকে নামেন। তারপর বন্ধুকে বিদায় দিয়ে বাড়িতে ঢোকেন।

গেটের দরজা খোলে নীপা। ভাইকে দেখে এগিয়ে যায় তারপর ঘাড়ে হাত রেখে ভেতরের দিকে আসতে আসতে জিজ্ঞেস করেন- কী রে, পুলিশ কী থানায় তোকে মারধর করেছে?

না তো! তপন পাল্টা জিজ্ঞেস করে, কেন মারধর করবে? তাহলে বেঁচে গেছিস তুই, নীপা জানায়। বলে, আমি শুনেছি পুলিশ যদি একবার ধরে তাহলে থানা হাজতে ঢুকিয়ে মারধর না করে ছাড়ে না।

বোনের গলার স্বর শুনে দিব্যি বোঝা যায় যে সে মনের আবেগ চেপে রাখতে চেষ্টা করছে। নীপা ভাইকে তার বিছানায় বসিয়ে এক এক করে পুরো ঘটনাটা শোনে। কোথায় ওদের ধরে। তারপর কোথায় নিয়ে যায়, কী কী জিজ্ঞেস করে, সেখানে আর কে ছিলো তারা তিনজন ছাড়া। কোনো ছাত্র লিডার কি ছিলো?

ইমরান সাহেব বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছেলেমেয়ে দু'জনের দিকে তাকিয়ে থাকেন। মনের খুব ভেতরের দিকে তখন বহু পুরনো দিনের একটা আবেগ ঝড়ে দূর-দিগন্তের গাছপালার মতো একবারে নিচু হচ্ছে আবার সোজা হচ্ছে। মৃত স্ত্রীর কথা মনে পড়ছে বারবার।

দেয়ালের প্রাচীন ঘড়িতে সময়ের আওয়াজ হলে যেন চমক ভাঙে তার। বলে ওঠেন, কী হয়েছে তোমাদের? খেতেটেতে হবে না? রাত কটা বাজলো, খেয়াল আছে?

বাবার ডাক শুনে ভাইবোন দুজনেরই যেন সম্বিত ফেরে। তপন চলে যায় হাত-মুখ ধুতে, মেয়ে বাবার সঙ্গে গিয়ে খাবার টেবিলের কাছে দাঁড়ায়। ইমরান সাহেবের স্মৃতির দিগন্তে তখনও ঝড় বইছে। মেয়ের মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন।

তাঁকে অমন তাকিয়ে থাকতে দেখে নীপার খটকা লাগে। সে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করে বসে- বাবা, তোমার কী হয়েছে? অমন করে তাকিয়ে আছো কেন? কী দেখছো?

মেয়ের ঐ কথায় যেন ঘোর কাটে ইমরান সাহেবের। বলে ওঠেন, না না, কিছু না, এমনি- তোমাদের মায়ের কথা মনে পড়েছিলো- যাক বাদ দাও ওসব- কিন্তু তুমি কেন যাওনি? তোমার খিদে লাগেনি?

মেয়েকে ম্লান হাসতে দেখে আবার বলেন, ছোট ভাইয়ের জন্য খুব চিন্তা হচ্ছিলো? ভাইকে খুব আদর করো, তাই না?

না না, ওসব কিছু নয়, কে বললো তোমাকে। নীপা গলার স্বরে নির্বিকার ভাব ফোটাতে চেষ্টা করে। বলে, তুমি তো জানো, আদরটাদর বা রাগ-

অভিমান- এসব সস্তা সেন্টিমেন্ট আমার ভালো লাগে না- একা একা বসে খেতে ভালো লাগে না, তাই খাইনি।

ইমরান-হাসান মেয়ের কথা শোনেন, তবে সরাসরি কিছু বলেন না। ও যখন থেকে বড় হচ্ছে, তখন থেকেই, মানে স্কুল ছাড়ার পর থেকেই লক্ষ্য করছেন, মেয়ের স্বভাব ঠিক ওর মায়ের মতো। মুখে বাবার চেহারার ছাপ থাকলে কী হবে; কথাবার্তা, চালচলন, হাবভাব সব ওর মায়ের মতো। একেবারে অবিকল। নিজের কষ্টের কথা সহজে অন্যকে জানতে দিতে চায় না। সব প্রশ্নের উত্তর দেয় সোজাসুজি, কোনো রকম ভনিতা করে না। অন্যের কাছ থেকে তো বটেই, এমনকি বাবার কাছ থেকেও টাকা নিতে ওর সঙ্কোচ হতে দেখা যায়। ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দেওয়ার পর থেকেই টিউশনি করতো সাপ্তাহিক মহিলা অফিসে। পার্ট টাইম চাকরিটা নেয়ার আগে পর্যন্ত ও স্কুলে দুটি মেয়েকে পড়াতো। একেক সময় খুব জেদী মনে হয়। কিন্তু পরে দেখেছেন, ওটা জেদ নয়, নিজের চিন্তাভাবনা আর বিচার-বিশ্লেষণকে ধরে রাখা। ওর ধারণা ইংরেজিতে এম এ পাস করতে পারলে জীবনের ভবিষ্যৎটাকে ও নিজের পছন্দ মতো গড়তে পারবে। অবশ্যি একটা ছোট কারণও আছে। ঐ সময় ফুফু ছেলে-মেয়ে নিয়ে দেশে বেড়াতে আসেন। তাঁর মেয়েটি নীপার সমবয়সী ও লন্ডনের ইম্পিরিয়েল কলেজে তখন সদ্য ভর্তি হয়েছে। তাঁর একমাত্র বোন লতা বুবুর ঐ মেয়ে সাবিতা কথায় কথায় খালি খোঁটা দিতো নীপাকে। ইংরেজিতে কথা বলতে পারতো না বলে। ঐ সময় সে বাবাকে চেপে ধরেছিলো ইংরেজি নভেল কিনে দেওয়ার জন্য, সদরঘাটের পুরনো বইয়ের দোকান থেকে তিনি এক কপি ডেভিড কপারফিল্ড এনেও দিয়েছিলেন মেয়ের হাতে।

তবে ঐ একখানাই- বেশি কিনে দেবেন কোত্থেকে? পয়সা-কড়ি থাকলে তো। তবু চেয়ে-চিন্তে এখান- ওখান থেকে এনে দিতেন। আর মেয়ে সে সব বই পড়তো। সায়েন্সের ছাত্রী, কিন্তু ইংরেজি নভেল পড়তো প্রায় নিয়মিত। সায়েন্সের সাবজেক্টগুলোতে ভালো নম্বর পায়নি- তার ফলে ফার্স্ট ডিভিশন থেকে বাদ। ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ইংরেজি সাহিত্যে অনার্স ক্লাসে ভর্তি হওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু পারেনি। সে জন্যে হতাশ হয়ে বসে থাকে- পড়াশোনাই সে আর করবে না। চেষ্টা চরিত্র করে শেষ পর্যন্ত পাসকোর্সে ভর্তি করিয়ে দেন। তাতে ভালোভাবেই পাস করে । ইংরেজি সাহিত্যে ভালো নম্বর পায়- শেষে এম. এ প্রিলিমিনারিতে ভর্তি হলো গত বছর- এখন ভালোয় ভালোয় ডিগ্রি নিয়ে বেরিয়ে আসতে পারলে হয়।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে হতে মাঝ রাত পার হয়ে যায়। বিছানায় গা রাখলেও ছাড়াছাড়ি নেই, মেয়ে বাবাকে নিজের হাতে ওষুধ খাওয়াবে। বলে, আজ তোমাকে নর্মাল ওষুধের সঙ্গে ঘুমের ট্যাবলেট খেতে হবে।

বাহ্ তা কেন? ইমরান বলেন, আমার তো এমনিতেই ঘুম পাচ্ছে।

তা পাক, মেয়ে আড়চোখে তাকায় বাবার দিকে। তারপর ওষুধ আর পানির গ্লাস এগিয়ে ধরে বাবার দিকে। বলে, মাঝরাত পার হয়ে গেছে, সকাল ন'টা পর্যন্ত না ঘুমালে তোমার প্রেশার বেড়ে যাবে- নাও, ওষুধটা খাও।

মেয়ের হাতের ওষুধ খেয়ে ইমরান হাসান বিছানায় গা এলিয়ে দেন আর বলেন, তুই যখন চলে যাবি এ বাড়ি থেকে, তখন কে আমাকে ওষুধ খাওয়াবে?

আমি চলে যাবো মানে? নীপা বাবার কথা ঠিক বুঝতে পারে না।

বাহ্! তোর বিয়ে হবে না? তোকে শ্বশুর বাড়ি যেতে হবে না?

মেয়ে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসে। যেন খুব হাসির একটা কথা বলেছেন। হাসতে হাসতে বলে, ঠিক আছে, দেখো তুমি, শেষ পর্যন্ত আমি কোন শ্বশুরবাড়ি যাই। একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে আবার বলে, ফিউডাল মিড্‌ল ক্লাস ট্রাডিশন থেকে তোমরা কবে যে মুক্ত হবে, বুঝতে পারি না। অথচ তোমরাই এ দেশে বিপ্লব আনতে চাও-

মন্তব্যটা করেই সে বাতি নিভিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

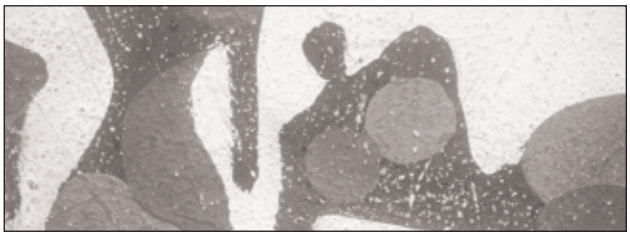

ইমরান হাসানকে বাড়ি ভাড়া দিতে হয় না। বরং উল্টো বাড়ি ভাড়া হিসেবে কিছু পায়। তাঁর বাবার নারিন্দা হাইস্কুলে যখন চাকরি ছিলো, তখন তার সহকর্মী বিনয় ভৌমিক বাড়িটা বিক্রি করে এদেশ ছেড়ে চলে যান। ঘটনাটা ঘটে '৬৪ সালের রায়টের অল্প কিছুদিন পরই। যশোরের কিছু জায়গা-জমি বিক্রি করে বাড়িটা কেনা হয়। আর কেনার পর থেকেই পেছনের দিকটা ভাড়া দেওয়া হয়- তিনটা কামরা আর বারান্দার সঙ্গে যোগ করা হয় রান্নাঘর আর বাথরুম। বলতে গেলে পুরো একটা বাসাই পেছনে তৈরি করে দেওয়া হয়। আর সেই তখন থেকেই ওটা ভাড়া দিয়ে আসছে। সেই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নি কখনও। '৭১-এর যুদ্ধের সময় হয়নি, তারপরও হয়নি। অবশ্যি ভাড়া বেশি পাওয়া যায় না। '৭১-এর পরে বাবার এক অবাঙালি বন্ধু ভাড়া নিয়েছিলেন, তাঁর ছেলে-মেয়েরাই রয়ে গেছে এখনও। তাই ইমরান হাসানের সংসার হলে, সেটা মোটামুটি ভালোই চলতো। নিজের মাস্টারির চাকরি, প্রাইভেট টিউশনি, সেই সঙ্গে আবার অনীতারও চাকরি জুটে গিয়েছিলো নতুন এক কেজি স্কুলে। স্বামী-স্ত্রী একই জীবিকা ধরে সংসার আরম্ভ করেন তারা।

ততদিনে কয়েকবারই পায়ের চিকিৎসা করা হয়েছে, কিন্তু লাভ হয়নি। অনীতার পীড়াপীড়িতে একবার কলকাতায়ও যাওয়া হয়েছিলো। কিন্তু তাতেও লাভ হয়নি। ফলাফল শূন্য। শুধু শুধু টাকাগুলো গচ্চা গেছে। উল্টো স্থায়ী ক্ষতি হয়ে গেছে বলে ঢাকার ডাক্তারবা জানান। তাঁদের মতে, গুলি লেগে যে ক্ষতি হয়েছে তা পূরণ হবার নয়। হাঁটুর জয়েন্টে যেসব টিসুর গোড়া বলতে কিছু নেই, সেসব টিসু কখনোই গজাবে না- তার ফলে হাঁটুর যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাই থেকে যাবে। যদি হাঁটু থেকে পা কেটে বাদ দিয়ে নকল পা লাগানো যায়, তাহলে অবশ্যি আলাদা কথা।

আগে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁটতেন, দূরে কোথাও যাওয়ার সময় দুই বগলের নিজে ক্র্যাচ নিতেন। কলকাতার ডাক্তার সর্বক্ষণ ক্র্যাচ ব্যবহার করতে বললেন। তাতে নাকি চলাফেরা সহজ হবে, হাঁটুর যে অংশের ক্ষতি হয়নি, সেই অংশ জোরালোভাবে কাজ করে সেই ক্ষতি পুষিয়ে দেবে এবং এক সময় ক্র্যাচে'র দরকার হবে না।

সেই কথা মতো ক্র্যাচের সার্বক্ষণিক ব্যবহার শুরু এবং এখনও তাই চলছে। আগে জখম হওয়া পায়ে যেটুকু ভর দিতে পারতেন, এক হাতে লাঠিতে ভর দিয়ে চলাফেরা করতে পারতেন। এখন তা পারেন না। ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াতে হলেও দুই বগলের নিচে ক্র্যাচ নিতে হয়। অনীতা উঠতে-বসতে গালাগাল করতেন কলকাতার ডাক্তারদের আর নিজের কপাল চাপড়াতেন। কারণ ঐ সময় দুনিয়ার একজন নামকরা হাড় বিশেষজ্ঞ ডাক্তার গার্স্ট সাহেবের তত্ত্বাবধানে আহত পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার জন্য নতুন হাসপাতাল খোলা হয়েছে ঢাকায়, অথচ সেদিকে তার নজর পড়লো না- স্বামীকে নিয়ে গেলেন কলকাতায়।

ওখানকার ডাক্তারদের ওপর ছেলেমানুষি রাগটা তাঁর মনের মধ্যে থেকেই গিয়েছিলো। যখন তাঁর নিজের চিকিৎসার জন্য কলকাতায় নিয়ে যাবার কথা হচ্ছিলো, তখন পাল্টা স্বামীকে রীতিমতো ধমকেছেন। বলেছেন, তোমার একবার গিয়ে শিক্ষা হয়নি, তাই না? কেন, ক্যানসারের চিকিৎসা কি ঢাকায় হতে পারে না? ঢাকায় ভালো ডাক্তার নেই? এতো বড় বড় হাসপাতাল কীভাবে চলছে তাহলে? রোগী যদি ভালোই না হবে?

না, বেশিদিন ভোগেননি। রোগ ধরা পড়ার মাস ছয়েক পরই একদিন সকাল বেলা, তখন বোধহয় বেলা দশটায় মতো হবে, ওঁদের স্কুলেরই একজন টিচার এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে গল্প করছিলেন। ঐ গল্প করার মাঝখানেই হঠাৎ কাতরানির আওয়াজ শোনা যায়। ইমরান ক্র্যাচে ভর দিয়েই ছোটেন ঘরের ভেতরে। দেখেন, মহিলার দু বাহুর ভাঁজে অনীতা আধাশোয়া অবস্থায় দুই হাতে পেটের মাঝখানটা চেপে রেখেছে আর আর্তনাদ করছে। ক্যানসার ধরা পড়েছিলো পাকস্থলীর নিচের দিকে। পেটের ওপরে হাত দিলে পেটের মাঝখানে পাথরের মতো একটা গোটলা টের পাওয়া যেতো। ইমরান পেটে হাত চেপে ধরেন কিন্তু গোটলাটা দেখেন পেটের মাঝখানে নেই। উপরে, পাঁজরের কাছে উঠে গেছে। স্ত্রীর অমন অবস্থা দেখে ডাক্তার ডেকে আনেন। ডাক্তার এসে রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অপারেশন করার সময় পাওয়া যায়নি। অপারেশন টেবিলে তোলার আগেই রোগীর শেষ নিঃশ্বাস বেরিয়ে যায়। ডাক্তার জানান, পাকস্থলী থেকে নাড়ি ছিঁড়ে যাওয়ার ঘটনাটি ঘটেছে- স্টমাক ক্যানসারের রোগীদের শেষ অবস্থায় এমনই নাকি হয়ে থাকে। এ্যাম্বুলন্সে করে যখন হাসপাতালে নেওয়া হচ্ছিলো, সঙ্গে মেয়েও ছিলো। অনীতা স্বামীর হাত ধরে বলেছিলেন, মেয়েটাকে এম এ পাস করিয়ে তারপর বিয়ে দিও, ওর পছন্দ মতো, আগে বিয়ে দিও না- আমাদের সব কথা ওকে জানিয়ে দেবে, কিছুই লুকাবে না। এ্যাম্বুলেন্সটা রাস্তা দিয়ে যাবার সময় সাইরেন বাজিয়ে যাচ্ছিলো। রাস্তায় তখন ভিড় ছিলো, জানালা দিয়ে হকারের চিৎকার ভেসে আসছিলো। এদিকে অনীতার গলার স্বরও মিইয়ে এসেছিলো, শব্দের উচ্চারণ হয়ে পড়েছিলো দুর্বল এবং ক্ষীণ, তবু তাঁর ঐ কথা ক'টি মেয়ে আর বাবা দু'জনেই স্পষ্ট শুনতে পেয়েছিলো এবং মেয়ে বুঝেও ছিলো। কেননা তখন ও স্কুলের সীমানা পার হয়ে এসেছে। যৌবনের জাগরণ শুরু হয়েছে দেহে যেমন, তেমনি মনেও।

ঐ দিনই দুপুর নাগাদ অনীতাকে নয়, তার প্রাণহীন দেহটাকে হাসপাতাল থেকে বাড়িতে আনা হয়।

ছেলে কীভাবে খবর পেয়েছিলো কেউ জানে না। ও নিজেই বলেছিলো পরে। ওর নাকি ক্লাসের পড়ায় মন বসছিলো না। মনটা থেকে থেকে ছটফট করছিলো। তাই টিফিনের পর আর ক্লাসে যায়নি, পালিয়ে সোজা বাড়িতে এসেছে।

না। ছেলে মেয়ে দু'জনের কেউই ডাক ছেড়ে কাঁদেনি। ভয়ানক চুপচাপ ছিলো আর চোখ তোলা ছিলো আকাশের দিকে- দু'গাল বেয়ে অঝোর ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিলো। ইমরানের তো অশ্রু ঝরাবারও সময় ছিলো না তখন। কারণ ক্র্যাচে ভর দিয়েই তাঁকে লাশ দাফনের ব্যবস্থা করতে হচ্ছিলো।

মা-বাপের দেওয়া নাম ছিলো পূর্ণিমা। গোলপানা মুখ- ফর্সা, উজ্জ্বল, জাতে বদ্যি। বাবা দামোদর সেন হোমিও ডাক্তার ছিলেন। মেয়ে আইএ পাস করার পর বিয়ের কথা উঠলে এবং ঘর-বর দেখা শুরু হলে- মেয়ে নিজেই তার পছন্দের পাত্রটিকে বিয়ে করার ইচ্ছা জানায়। তাতে বাড়ির সবাই ক্ষেপে যায়। বাপের পছন্দ করা পাত্রের সঙ্গে বিয়ের কথা যখন পাকা করা হয়, আয়োজনও শুরু হয়ে গেছে, তখনই মেয়ে পালায়। থানা শহর কেশবপুর থেকে একেবারে দক্ষিণে গ্রামের দিকে- ওখানেই এক শিবমন্দিরের পুরহিত ঠাকুরের কাছে গেলে উনি দু'জনকে ঠাকুরের সামনে বসিয়ে বিয়ের মন্ত্র পড়িয়ে দেন। মঙ্গলঘট উনিই জোগাড় করেন, আগুনের কুন্ডও। নির্জন মন্দিরে মধ্যরাতে শিব ঠাকুর, চন্দ্রতারা আর বনের বৃক্ষরাজিকে সাক্ষী রেখে পুরোহিত মহাশয় দু'জনের উদ্বাহকর্ম সম্পাদন করেন। পূর্ণিমা সেন হয়ে যায় অরবিন্দ সরকারের বিবাহিতা বধূ পূর্ণিমা সরকার।

কিন্তু হলে কী হবে, বাপ-মায়ের দেওয়া নামটা সে নিজেই বাতিল করে নতুন নাম নেয়। সদ্য বিয়ে করা স্বামীকে বলে, আজ থেকে আমার নাম অনীতা- তুমি আমাকে অনীতা বলে ডাকবে, তোমার চেনা-জানা লোকদেরও বলবে যে আমার নাম অনীতা। মনে রেখো, আমাকে কেউ আনেনি, আমি নিজে এসেছি। মা- বাবার প্রথম সন্তান আমি। প্রথম সন্তান মেয়ে হোক, ওরা তা চাননি। তবু আমি জন্ম নিয়েছি। আমার অন্য জায়গায় বিয়ে দেওয়া হচ্ছিলো, বর আর তার সহযাত্রীরা আমাকে আনতে যেতো, কিন্তু আমি রাজি হইনি। তোমাকে খবর পাঠিয়েছিলাম। তুমিও যাওনি, তাই আমি নিজেই চলে এসেছি। তারপর আমাকে বিয়েও করতে চাইছিলে না। বলছিলে রাখবো কোথায়। খাওয়াবো কী- এই রকম কতো ধানাইপানাই করলে- আমি শুনিনি, আমিই ঠাকুর মশাইর হাতে-পায়ে ধরে তাঁকে রাজি করিয়েছি, তুমি আমাকে বিয়ে করোনি। আমি তোমাকে বিয়ে করেছি- তাই এখন থেকে আমি অনীতা, আমাকে কেউ আনেনি- আমি নীতা হইনি। আমি নিজে এসেছি। এখন যে শ্বশুরবাড়ি যাবো, তাও নিজেই যাবো- কেউ আমাকে নিয়ে যাবে না, যদি কেউ যায়, তাহলে সে আমার সঙ্গে যাবে, আমি তার সঙ্গে যাবো না -শুধু দেখবো আমার শাশুড়ি মা আমাকে বরণ করে নেন কি না।

না সে ব্যাপারে কোনো অসুবিধা হয়নি। তাঁকে জানানো হয়নি বলে শাশুড়ি বোধহয় মনে কষ্ট পেয়েছিলেন, কিন্তু সেটা বাইরে প্রকাশ করেননি। ছেলের বউকে ঠিকভাবেই বরণ করে নিয়েছিলেন। স্কুলে পড়া দেওরটিরও খুব পছন্দ হয় নতুন বৌদিকে । এক ননদ ছিলো, অরবিন্দের দিদি। সে তখন মনিরামপুর থাকে। সেখানে খবর পৌঁছানো হলেও সে ভাইয়ের নতুন নতুন বউকে দেখতে আসেনি।

ঘনিষ্ঠ বন্ধু ইমরান, কিন্তু সে খবর পায় প্রায় মাস দুই পরে। কারণ যশোর এলাকা থেকে খোঁড়া পা নিয়ে ঢাকায় আসার পর বেশ কিছুদিন তাঁর এমনিতেই যোগাযোগ ছিলো না। আসলে ইচ্ছে করেই যোগাযোগ রাখেননি। তখন আন্ডারগ্রাউন্ড সব পার্টি আর গ্রুপের ওপর সরকারের পুলিশ আর রক্ষীবাহিনীর হামলা চলছে। কারুরই কোনো নির্দিষ্ট ঠিকানা নেই। একরাত যে গাঁয়ে কাটায়, পরের রাত সে গাঁয়ে কাটাতে পারে না, এমন অবস্থা। তারপর আবার গ্রুপে গ্রুপে রেষারেষি, মারামারিও শুরু হয়ে গেছে। কখন যে কী হয়, কেউ বলতে পারে না। অনেকেই নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে তখন। ইমরানে নিজেরও মন থেকে বিপ্লবের তাগিদ হালকা হয়ে গেছে। জীবনের অন্য পথ ধরার কথা ভাবছিলেন। তাই প্রাইভেটে বি.এ পরীক্ষাটাও দিয়ে ফেলেছেন। ঐ সময় হঠাৎ একদিন অরবিন্দ এসে হাজির। তার কাছ থেকেই গত দেড় বছরের পুরো খবর জানতে পারেন। নিজের বিয়ে করার বৃত্তান্তটাও সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বর্ণনা করে। পূর্ণিমার নাম যে বদলে গেছে, তাও বলতে বাকি রাখে না। বলে, অনীতাই আমাকে পাঠিয়েছে। বললো, এভাবে থাকা যায় না, তুমি অন্তত বেঁচে থাকবার মতো জায়গায় আমাকে নিয়ে চলো।

প্রথমে ঐ পর্যন্ত বলে, তাতে স্পষ্ট কিছু বোঝা যায় না- শুধু এটুকু ধারণা হয় যে, অরবিন্দ বউকে নিয়ে অন্য কোথাও সরে যাবার চিন্তা করছে। শেষে যাবার দিন বিদায় নেবার সময় একেবারে হাত ধরে খোলাখুলি বলে, আমি ঢাকায় এসে থাকতে চাই কিন্তু একটা ব্যবস্থা করে দে ইমরান ভাই।

ইমরান বন্ধুকে কোনো আশ্বাস দিতে পারেন না। শুধু বলেন, আমার অবস্থা তো দেখছিস, চলাফেরা করতে পারি না, আমি কী ব্যবস্থা করতে পারবো বল? তবে পূর্ণিমাকে নিয়ে আমার এখানে চলে আসতে পারিস, তারপর চেষ্টা করে দেখ, নিশ্চয়ই কিছু একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

তার কয়দিন পরই পূর্ণিমাকে নিয়ে অরবিন্দ ঢাকায় এসে বন্ধু ইমরানের বাসায় ওঠে। ইমরানের জন্য ভালোই হয়। তার সঙ্গী জোটে। অন্তত মন খুলে কথা তো বলতে পারবে। অবশ্য সংসার খরচের সমস্যা ছিলো- কারণ বাড়ির যে অংশটা ভাড়া দেওয়া আছে, সেখান থেকে যা পাওয়া যায় তাতে একজন কি দু'জনের চলতে পারে, তিন জনের চলা মুশকিল।

পূর্ণিমা আসার কয়েক দিন পরই কাজের মানুষ কলিমের মাকে বিদায় করে দেন ইমরান। কাজটা করেন পূর্ণিমার কথাতেই। কলিমের মা দু'তিন দিন পর একদিন আসতো না, নিজের নয়তো ছেলের অসুখের ছুতো দেখাতো। আর যেদিন আসতো না সেদিন সকাল দুপুর রাত- তিন বেলারই খাবার খেতে ক্র্যাচে ভর দিয়ে যেতে হতো হোটেলে, রেস্টুরেন্টে। অমন

ঘটনা দেখেই একদিন পূর্ণিমা এসে বলে, আমাকে কাজটা দিন, আমি ফাঁকি দেবো না।

কোন কাজ, কিসের কাজ? ইমরান ঠিক বুঝতে পারেন না।

আরে কলিমের মা যে কাজটা করে, একদিন দেখুন, কেমন কাজ করি আমি।

কথাটা ঠাট্টার মতো করে বলা। কিন্তু যখন দেখলেন কলতলায় থালাবাসন আর হাঁড়িকুড়ি মাজছে, এক সময় স্বামীকে বাজারে পর্যন্ত পাঠালো, তখন আর মনে সন্দেহ সংশয় রইলো না। ইমরান কলিমের মাকে মাস ফুরোবার, আগেই পুরো বেতন দিয়ে বিদায় করে দেন।

প্রথম ক'দিন খুব আনন্দে কেটেছিলো ইমরানের। যেন অন্য কোনো জগতে বাস করছেন এমন মনে হচ্ছিলো। বিছানার চাদর-বালিশ পরিষ্কার, গেঞ্জি-তোয়ালেও। ঘরের মেঝে তকতকে ঝকঝকে, সকালে রুটি-তরকারির সঙ্গে চা পাচ্ছেন, নিজের ঘরের টেবিলে পানির জগ আর গেলাস, স্নানের ঘরে বালতি ভর্তি পানি। আর দু'জনার মধ্যে মান-অভিমান, নয়তো ঝগড়ার দৃশ্য দেখছেন।

অরবিন্দের সঙ্গে যখন গল্প হতো। তখন অনীতা পাশে এসে বসতো, কখনো হালকা কথাবার্তা হতো। কখনো সিরিয়াস। হালকা কথাবার্তা মানে দু'জনের প্রেমের ঘটনা নিয়ে কথা। থার্ড ইয়ারে বিন্দো আর ফার্স্ট ইয়ারের পূর্ণিমা মেয়েদের কমন রুমের পাশে- আমগাছটার গুঁড়ির আড়ালে বসে কী আলাপ করছে তা শোনার জন্য সাজেদা আর বকুল যায়। পা টিপে টিপে নিঃশব্দে গাছের গুঁড়ির অপর পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। আলাপ শোনার জন্য কান পাততে যাবে, হঠাৎ বকুলের চোখে পড়ে তার মাথার ওপর প্রকান্ড একটা সাপ এক ডাল থেকে অন্য ডালে যাবার জন্য দুলছে। তখন প্রেমালাপ শুনবে কি? চিৎকার করে পালাতে দিশা পায় না। ঐখানেই মেয়েটা অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। ঘটনাটা নিয়ে সে কী হৈ! বিন্দো-পূর্ণিমার প্রেমের খবর সারা কলেজে রটে যায়।

গল্পটা ভারি সুন্দর করে বলে অনীতা। তারপর জানায় ঐ সাপ দেখে বকুলের অজ্ঞান হওয়ার ঘটনাটা যদি না ঘটতো তাহলে আমরা দু'জন ঘনিষ্ঠ হতে পারতাম না।

না। শুধু ঐ ঘটনাটা নয়, ইমরান স্মরণ করিয়ে দিয়ে। বলে, অরবিন্দ যে বিপ্লবী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিলো, সেই খবরটাই ওর ইমেজ বাড়িয়ে দিয়েছিলো- আর তাতেই তোমার আকর্ষণ বাড়ে, ঠিক কি না বলো?

হ্যাঁ, তা বলতে পারো, তখন থেকেই ওকে আমি অন্য চোখে দেখতে শুরু করি। আর ঐ সময়ই আমি রেভ্যুলেশন নিয়ে লেখা বইপত্র পড়তে আরম্ভ করে দিই। বকুল তো বিএ পাস করার পর স্কুল মাস্টারিতে ঢুকেছিলো শুধু রেভ্যুলেশনে কমিটেড ছিলো বলে।

শুধু কি বকুল? মাজহারের কথাও ওঠে স্মৃতিচারণায়- হ্যাঁ, সেই মাজহার। দুর্ভিক্ষে মানুষ মারা গিয়েছিলো বলে দুই আড়তদারকে সামনাসামনি দাঁড়িয়ে গুলি করে মারে। তারপর উধাও হয়ে যায়। কোথায় যে যায়, কেউ হদিস বার করতে পারেনি।

শুধু হালকা গল্পই নয়। সিরিয়াস, বিষয় নিয়েও আলোচনা কম হতো না- অরবিন্দ একদিন তো বলেই বসলো, দেখ ইমরান, আমরা যতোই ছুতো খুঁজে বার করি না কেন, দাঁড়াবার আসল জায়গা থেকে আমরা যে এসকোপ করছি, এটা অস্বীকার করতে পারবো না। আমার মন থেকে খটকাটা এখনো যায়নি- এখনো নিজেকে প্রশ্ন করে চলেছি, কাজটা ঠিক করছি? না কি ভুল করছি- অনীতা যতোই বলুক কাজটা ঠিক হচ্ছে কিন্তু আমার মন থেকে সংশয় যাচ্ছে না। জানি না ভাই, কোনটা ভুল আর কোনটা ঠিক!

দিন কয়েক পরই একজন লোক খবর নিয়ে এলো যে, দলের দুই গ্রুপই আপোস করার জন্য আলোচনায় বসতে চায়- পার্টি ভেঙে যাক সেটা কোনো গ্রুপই চায় না, বিশেষ করে এখন, যখন পার্টির নেতা-কর্মীদের ওপর হামলার পর হামলা হচ্ছে। কমরেড অরবিন্দকে ঐ মিটিং-এ থাকতে হবে।

তা কোথায় হবে মিটিং? সংবাদদাতা সেটা ঠিকমতো বলতে পারে না। বলে, সেটা এখন জানানো হচ্ছে না। সবাই যশোরে পৌছালে তখন জানানো হবে তবে আমার মনে হয়, কেশবপুর এলাকাতেই হতে পারে। আবার কলারোয়াতেও হতে পারে।

তার মানে, সাতক্ষীরার কমরেডরাও আছে এর মধ্যে? ইমরান হাসান নিশ্চিত হতে চান।

বাহ্, অমন গুরুত্বপূর্ণ একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, সবাই না থাকলে চলে? আগন্তুক কমরেড জানায়। বলে, যশোর, খুলনা, কুষ্টিয়া, পাবনা এমনকি বরিশালের দিক থেকেও কমরেডদের আসার কথা আছে।

মিটিং কি প্রকাশ্যে হবে? এবার সোজা সুজি প্রশ্ন ইমরানের।

না না, সংবাদদাতা বলে, তা কেন হবে। এটা তো পার্টির ভেতরকার সমস্যা- এই আলোচনা প্রকাশ্যে হওয়া কি ঠিক?

লোকটার কথা শুনে মনে হয়, কিছু যেন লুকানো হচ্ছে, তার কথা পুরোপুরি বিশ্বাস হতে চায় না। কিন্তু অরবিন্দের মনে কোনো সন্দেহ জেগেছে বলে মনে হয় না। সে বলে, কেন বিশ্বাস হবে না বলো? এক পার্টিতে বিলং করে সবাই। মাঝখানে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিলো, এখন নিজেরাই উদ্যোগ নিয়ে মিলে মিশে এক হয়ে যেতে চাইছে, তো এর মধ্যে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন কেন আসবে?

সংবাদদাতা কমরেড খবরটা জানিয়েই বিদায় নেয়। কারণ তাকে আরও কয়েক জায়গায় যেতে হবে।

আরবিন্দ সেদিনই রওনা হবার জন্য তৈরি হতে আরম্ভ করে। অনীতাও যাবার জন্য তৈরি হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অরবিন্দ তাকে নেয় না। বলে, আমি যাবো আর মিটিং শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফিরবো। তুমি গেলে দেরি হয়ে যাবে।

অনীতা স্বামীর কথা মেনে নেয়। শুধু বলে, সাবধানে থাকবে। আর দেরি করবে না, ঝগড়া-বিবাদে অংশ নেবে না।

বিদায় নেবার সময় অরবিন্দ হাসতে হাসতে বন্ধুকে বলে, তোর হেফাজতে রেখে গেলাম আমার উত্তমার্ধকে। দেখে রাখবি, এসে যেন তাকে উত্তমভাবেই ফিরে পাই।

অরবিন্দ আর ফেরেনি। পাঁচ দিনের দিন ফিরে আসবার কথা ছিলো, কিন্তু সাতদিন পার হয়ে যাবার পরও কোনো খবর নেই- উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠায় অস্থির হয়ে ওঠে অনীতা। এখানে-ওখানে নানান সম্ভাব্য জায়গায় খবর নেওয়ার চেষ্টা করা হয়- কিন্তু লাভ হয় না। শুধু খবরের কাগজে অস্পষ্ট একটা খবর পাওয়া যায় যে সাতক্ষীরা মহকুমার কলারোয়া থানার দূরবর্তী গ্রামে গোপন বিপ্লবী দলের গোপন বৈঠকে পুলিশ হানা দিলে গোলাগুলি এবং তাতে বিপ্লবী দলের কয়েকজন সদস্য হতাহত হয়, বিস্তারিত খবর জানা যায়নি। পুলিশ গোটা এলাকা ঘিরে রেখেছে।

ব্যস ঐটুকুই খবর। আর তাতে উৎকণ্ঠা দুশ্চিন্তা বাড়ে বই কমে না। দশ দিন পার হয়ে যাবার পর অনীতা বলে, আমি এবার যাই, কী হয়েছে ঘটনা, খবরটা নিয়ে আসি।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে ইমরান না বলতে পারেন না। কীভাবে বলবেন? কয়েক দিন ধরেই উদ্বিগ্ন আর দুশ্চিন্তাকাতর মুখখানা দেখছেন। হয় বারান্দায় নয়তো জানালার ধারে দাঁড়িয়ে আছে, অস্থির অপেক্ষার দৃশ্য কতোদিন দেখা যায়? তাই নিজেই ট্রেনে তুলে দিয়ে আসেন। ট্রেন ছাড়বার সময় জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে অনীতা বলে, আমাকে একটা কথা বলো, ওর খোঁজ যদি না পাই তাহলে কী করবো? এখানে, মানে ঢাকায়, তোমার ওখানে ফিরে আসবো? নাকি ওখানেই থেকে যাবো?

ভয়ানক কঠিন প্রশ্ন। ইমরানের কাছে ঐ প্রশ্নের জবাব ছিলো না। কী বলবেন বিপর্যয়ের শেষ ধাপে দাঁড়ানো বন্ধুপত্নীকে? যে মা-বাবার বাড়ি ছেড়েছে ভালোবাসা নিয়ে বাঁচবার জন্য। তারপর স্বামীকে নিয়ে প্রবাসে এসেছে জীবনের ভবিষ্যৎ নির্মাণ করার জন্য, তাকে অমন বিপদের মুখে দাঁড়ানো বুঝে কী বলতে পারেন তিনি?

কী হলো? বলো? আমি কী করবো? ফিরবো? নাকি থেকে যাবো?

তোমার যা ভালো মনে হবে তাই করবে।

হ্যাঁ, ঐ একটা জবাবই ইমরান সেই মুহূর্তে খুঁজে পান। আর সেটাই দিতে হয়েছিলো তাঁকে।

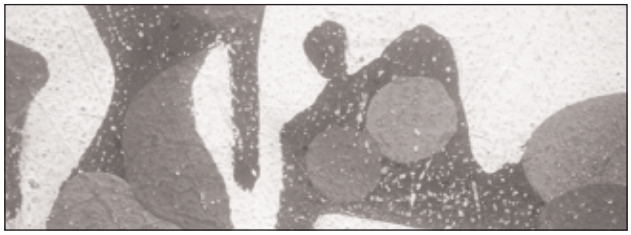

এবং অদ্ভুত কান্ড। সপ্তাহ খানেক কেটে যাওয়ার পরও অনীতা বা অরবিন্দের কোনো খবর না পাওয়ায় তাঁরও মনে অস্থিরতা জেগে উঠতে আরম্ভ করে। উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা তাঁর মনকেও অধিকার করে নেয়। দিন দশেক পার হবার পর অচেনা লোক মারফত একখানা চিঠি পান। চিঠিখানা দীর্ঘ নয়। আবার সংক্ষিপ্তও নয়। তাতে লেখা, মাথায় পুলিশের রাইফেলের গুলি লেগে অরবিন্দ তৎক্ষণাৎ মারা গেছে। ওর ডেডবডি কেশবপুর থানায় এনে ওর মা আর ভাইয়ের কাছে পৌঁছে দেয় পুলিশ। শেষকৃত্ত। ওখানকার শ্মশানেই সম্পাদন করা হয়। ওদের বাড়িতে এখনো আছি। ওর মা ছেলের জন্য কেঁদে কেঁদে বিলাপ করেন, আর আমাকে দোষী করেন, তবু আছি। শ্রদ্ধে পর্যন্ত থাকবো-যশোরে বাবার ওখানে গিয়েছিলাম, কিন্তু ভাই-বোনদের দুর্ব্যবহারে ওখানে টিকতে পারিনি। আর এখানে গ্রামে মানে শ্বশুর-বাড়িতে থাকারও কোনো কারণ খুঁজে পাচ্ছি না- এখানে করার কিছু নেই- অনিশ্চিত জীবন খুবই খারাপ, একেবারেই দুর্বহ।

অনীতা চিঠিতে স্পষ্ট করে কিছুই লেখেনি। যশোরে বা গ্রামে যে থাকবে না, তা বোঝা যায়, কিন্তু কোথায় থাকবে তার কোনো আভাস দেয়নি।

আবার একাকী নিঃসঙ্গ জীবন। একখানা পা নিয়ে তো বাইরে স্বচ্ছন্দে আর স্বাভাবিকভাবে ঘোরাফেরা করা যায় না। আর খোঁড়া ল্যাংড়া লোকের সঙ্গে কথা বলতেই বা কে পছন্দ করে- বাড়িতে দু'জন জুটেছিলো, তারও রইলো না। তবু ঐ অবস্থায় কোনোদিন পার্কের লেকের ধারে গিয়ে বসে থাকে, নয়তো বাংলাবাজারে বইয়ের দোকানে দোকানে ঘুরে বই দেখে।

ঐ রকম সময়ে পরীক্ষায় রেজাল্টও বেরিয়ে যায়। তাতে একটা করার মতো কাজ তৈরি হয়। আর তা হলো, চাকরির জন্য দরখাস্ত করা। ল্যাংড়া-খোঁড়া লোকের চাকরি হওয়ার কথা নয়। তবু স্কুলে স্কুলে দরখাস্ত নিয়ে ঘোরাঘুরি করেন। বিএ তে সেকেন্ড ডিভিশনটা তো একেবারে ফেলনা নয়, সেই সঙ্গে বাবার পরিচয়টা তো ছিলোই। কোনটার জন্য ঠিক মতো বলতে পারবেন। উয়ারির নতুন স্কুলে একটা চাকরি জুটে যায়। আর তার ফলে নিঃসঙ্গতা তাঁর আর থাকে না। সকাল বেলার টিউশনি, তারপর দশটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত স্কুল। সকাল দুপুর বিকেল- ছাত্র আর ছাত্র। গল্প হাসি মস্করা, দুষ্টুমি নালিশ আর বিচার। ইমরান হাসানের দিন কোন সময় আরম্ভ হয় আর কোন সময় ফুরিয়ে যায়, খেয়াল রাখতে পারেন না। সমস্যা শুধু একটাই, আর তা হলো স্বচ্ছন্দে হাঁটাচলা করা যায় না। হাঁটুর ব্যথাটা ক্রমেই যেন বাড়ছে বলে মনে হয়। ডাক্তারের কাছে গেলে তিনি শুধু ব্যথা কমার ওষুধ দেন আর বলেন, চলাফেরা করবেন।

স্কুল শেষে একদিন বাড়ির গেটের কাছে তাঁকে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়। ভেতরে ঢুকতে পারেন না। দেখেন গেটের দরজায় হেলান দিয়ে বসে ঘুমিয়ে আছে অনীতা। শুকনো এলোমেলো চুল, পরনের শাড়ি-জামা খুবই মলিন, ঘাড়ের ব্যাগ আর একটা পোটলা হাঁটুর নিচে রাখা। চোখের নিচে কালি, মুখখানা শুকনো, আগের উজ্জ্বলতার ছিটেফোঁটাও কোথাও নেই। নিচু গলায় ডাকা হলে, ধড়ফড় করে উঠে দাঁড়ায়। মুখে হাসি আনতে চেষ্টা করে কিন্তু হাসি ফোটে না। মনে হয় ঠোঁট বাঁকিয়ে দাঁত বের করে ভেংচি কাটছে। ঐ অবস্থাতেই মাথার ওপরে আঁচলটা টানতে টানতে বলে, হলো না, থাকতে পারলাম না; তাই চলে এসেছি।

ইমরান হাসান তার কথায় কান দিতে পারেন না, তখন খুবই অস্থির বোধ করছেন। তাড়াতাড়ি গেট খোলেন। তারপর ভেতরে ঢুকে প্রথমে অনীতার ঘরের দরজা খুলে তাকে ঘরের ভেতরে ঢুকিয়ে দেন। আর বলেন, চানটান করে নাও, দুপুরে কিছু খেয়েছো?

ওসব পরে হবে। খুবই ক্লান্ত আর প্রায় অস্ফুট গলায় অনীতা বলে, আমি এখন এক গ্লাস জল খেয়ে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকবো। আমার জন্য ব্যস্ত হওয়ার দরকার নেই।

ইমরান লক্ষ্য করেন, অনীতার দাঁড়িয়ে থাকার শক্তিটুকুও যেন নেই। নিজেই ওকে শুইয়ে দেন।

আসলে কী হয়েছে বোঝা যায় না- অনীতা এখন যেন অন্য মেয়ে। কথাবার্তা, চলাফেরা, বেশবাশ সব বদলে গেছে- ও এখন একেবারেই অন্য মেয়ে।

হ্যাঁ, বেশ কিছুদিন লেগে যায় ওর ধাতস্থ হতে। প্রথম কদিন তো নিজের কাপড় চোপরই ঠিকমতো গায়ে থাকতো না- সে অবস্থা কাটলে, দেখা যায় কী পরছে না পরছে তারই যেন হুঁশ নেই। একদিন বিধবার থান পরলো তো পরের দিন একেবারে সধবার বেশ। পরনে রঙিন ঝলমলে প্রিন্টের শাড়ি, রঙিন ব্লাউজ, হাতে চুড়ি-বালার গোছা, কপালে টিপ আর সিঁথিতে সিঁদূর পর্যন্ত।

এসব করে, কিন্তু রান্নাঘরের দিকে একবার উঁকিও দেয় না। রান্নার কাজ সেই মহিলাই করছে, গত তিন মাস ধরে যে করে আসছে।

ঐ রকম সময়ে একদিন বিকেলে একটা দুর্ঘটনা ঘটে। বড় কিছু নয়, ঘটনাটা বলা যায় সামান্যই। সেদিন বিকেলে আকাশে মেঘ করেছিলো, মেঘের ডাকও শোনা যাচ্ছিলো। রাস্তায় জ্যামে পড়ে যাওয়ায় রিকশা থেকে নেমে পড়েন। বাড়ি সেখান থেকে সামান্য দূরে। রিকশা ছেড়ে দিয়ে ক্র্যাচে ভর দিয়ে একটু তাড়াতাড়ি পথ চলছিলেন। বাড়ির গেটের কাছাকাছি পৌঁছতেই ঝড়-বৃষ্টি আছড়ে পড়ে মাথার ওপর। গেট ঠেলে ভেতরে ঢুকে সিঁড়ির ওপর ক্র্যাচটা রেখে পাখানা তুলতেই পিছলে যায় সেটা। আর তাতে উপুড় হয়ে আছড়ে পড়েন সিঁড়ির ওপর। কিছুক্ষণ উঠতে পারেন না। তখন ঝড়বৃষ্টি আর বাজ পড়ার আওয়াজ হচ্ছে চারদিকে। অনেকক্ষণ চিৎকার করতে হয়। শেষে দরজা খোলে এবং অনীতা বেরিয়ে এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরে টেনে তোলে। সে একটু টানতে টানতে ঘরে নিয়ে চেয়ারে বসায়। ভ্রূ'র ওপরটা কেটে গিয়েছিলো। তখনও রক্ত ঝরছে। সে আঁচল দিয়ে প্রথমে রক্ত মোছে। তারপর শুকনো তোয়ালে এনে জামা গেঞ্জি খুলে মাথা গা হাত মুখ মোছে। শেষে লুঙ্গি গেঞ্জি এনে বিছানায় রেখে ঘরের বাইরে চলে যায়। মুখে কিছু বলে না। নিজের পোশাক খুলে লুঙ্গি গেঞ্জি পরে যখন বিছানায় বসেছেন তখন দেখেন, তুলা আয়োডিন নিয়ে এসেছে এবং দেরি না করে লাগিয়েও দেয়। তার একটু পরই রসুন সর্ষের তেল গরম করে এনে অনেকক্ষণ ধরে ঘাড়ে বুকে পিঠে হাতে পায়ে মালিশ করতে থাকে। নিন ধরুন, গাতটা লম্বা করুন। উপুড় হোন, এবার চিৎ হোন- এই রকম কিছু শব্দ উচ্চারণ করে চলে কিন্তু কোনো কথা বলে না।

তার কান্ড দেখে অবিশ্বাস্য লাগে। হাসিখুশি বুদ্ধিমতী মেয়ে অনীতা যে কীভাবে এমন বদলে গেলো, তাকে তো কখনোই স্বাভাবিক মনে হয় না - স্বামীর শোকে কি পাগল হয়ে গেছে ও?

একদিন ডেকে বলেন, অনীতা, একটা চাকরি খুঁজি তোমার জন্য?

অনীতা কোনো জবাব দেয় না। শুধু ড্যাবড্যাব করে চোখ মেলে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার আর সন্দেহ থাকে না। বুঝে নেন, স্বামীকে হারিয়ে অনীতা মানসিক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে গিয়েছে।

তাকে বই পড়তে দেওয়া হয়। বই পড়া শেষ হয়েছে জানালে বইয়ের বিষয় নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করেন। অনীতা আলোচনা করে, কিন্তু অনেক এলোমেলো কথা বলে। একদিন স্কুলের এক অনুষ্ঠানে নিয়ে যান। সেখানে স্কুলের সহকর্মীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। না কোনো কিছুতে সংকোচ করেন না। কিছুই গোপন করেন না। অনীতার স্বামী কীভাবে খুন হয়েছেন, কোন ধরনের রাজনীতি করতেন সবই জানিয়ে দেন। অনীতা শুধু শুনে যায় আর গোল গোল চোখ মেলে চারদিকে তাকায়।

বেশ সময় লাগে। কিন্তু তবু ক্রমে স্বাভাবিক হয়ে আসে অনীতা। তার চাকরির ব্যবস্থাও হয়ে যায় নতুন আরম্ভ হওয়া এক কেজি স্কুলে। তখন একদিন ছালকা ভঙ্গিতে বলেন, অনীতা তুমি পাঁচফোড়ন দিয়ে সেই কুমড়ো পেঁপে আলু পটল দিয়ে নিরামিষ ঘন্টো রান্না করো না কেন? তোমার হাতের রান্না ঐ ঘন্টো খেলে তা ভোলা যায় না। তুমি আজ কিন্তু রাঁধবে। বুঝেছো?

ঐ কথায় অনীতার চোখেমুখে কেমন একটা ভীতচকিত ভাব ফুটতে দেখা যায়। সে বলে ওঠে। না ইমরান। আমি তোমাকে কোনো কিছু বেঁধে খাওয়াতে পারবো না।

তার কথা শুনে খুশি হন ইমরান। বিপর্যস্ত অবস্থায় আসার পর থেকে তাকে আপনি বলছিলো, আজই প্রথম তুমি বললো। তাই খুব সহজভাবেই জিজ্ঞাসা করে, কেন রাঁধতে পারবে না?

ডাইনে-বাঁয়ে তাকাতে তাকাতে বলে, সে কথা আমি বলতে পারবো না। বললে আমাকে তুমি এখানে থাকতে দেবে না। তাড়িয়ে দেবে।

কথাটা বলা শেষ হওয়ার আগেই ও ফুঁপিয়ে ওঠে, তারপর ছুটে নিজের ঘরে চলে যায়।

ইমরান হাসানের অনুমান হয়, ভয়ানক লজ্জাকর আর অপমানকর কোনো ঘটনা ঘটেছে ওকে নিয়ে। এও মনে হয় যে ব্যাপারটা মনের মধ্যে যতো চেপে রাখবে ততোই তা মনের ওপর বোঝার মতো ভারী হতে থাকবে। তার মনে হয়, ব্যাপারটা আসলে কী ঘটেছে সেটা বাইরে সবার কাছে না হোক, অন্তত ঘনিষ্ঠ আপনজনের কাছে তার খুলে বলা উচিত।

তাকে চাপ দেওয়া হয় না। বরং এমন ভাব দেখানো হয় যে, তার গোপন ব্যাপারে জানবার জন্য কারুরই কোনো আগ্রহ নেই।

এপয়েনমেন্ট লেটার পাওয়া গিয়েছিলো কিন্তু পাঁচদিন পর স্কুলের কাজে জয়েন করে অনীতা। সঙ্গে ইমরানও গিয়েছিলো। অনীতাকে ক্লাসরুমে যেতে দেখে ফিরে আসে এবং স্কুল থেকে ফিরলে ফুল হাতে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে থেকে অনীতাকে অভিনন্দনও জানায়। ইংলিশ কায়দায় হাতে ফুল তুলে দিয়ে বলে, উইশ ইউ এ হ্যাপি এ্যান্ড সাকসেসফুল টিচিং ক্যারিয়ার।

সেদিনই দেখা যায় অনীতা তার আড়ষ্টতা অনেকখানি কাটিয়ে উঠেছে। সে প্রায় স্বাভাবিকভাবে হাসে, অনেক ধন্যবাদ শব্দ দুটো উচ্চারণ করে।

তারপর বিকেলে বারান্দার দাঁড়িয়ে থাকবার সময় ইমরান হাসান পাশে এসে দাঁড়ায় আর বলে, আজ কি আমার আবদারটা রাখা হবে? কী বলছো তুমি? কিসের আবদার! অনীতা ঠিক বুঝতে পারে না।

বাহ এর মধ্যে ভুলে খেলে? সেই যে নিরামিষ ঘন্টো রান্নার কথা বলেছিলাম?

ইমরানের কথা শুনে ঘুরে দাঁড়ায় অনীতা। তারপর অদ্ভুত দৃষ্টি মেলে চোখে চোখে তাকিয়ে থাকে। তার দুচোখে অশ্রু টলমল করে ওঠে। ঐ অবস্থাতেই কান্নায় ভেঙে পড়তে পড়তে সে বলে। আপনি বোঝেন না কেন? আমি সেই অনীতা আর নেই, চেষ্টা করলেও হতে পারি না। আমি এখন অন্য মেয়ে মানুষ। অপবিত্র, নোংরা আর ঘৃণ্য। আমার হাতের রান্না আমি আপনাকে খাওয়াতে পারি না।

খুবই দুর্বোধ্য লাগে। শুধু কাঁদছে বলে নয়, সে আবার আপনি বলে সম্বোধন করছে। ইমরান অনীতার হাত ধরে, বগলের নিচে ক্র্যাচ থাকা সত্ত্বেও তার মনে হয় অনীতা যেন অনকে দূরে চলে যাচ্ছে। কিন্তু ব্যাপারটা কী তা জানতে হবে। বলে, তোমার কী হয়েছে? কেন স্বাভাবিক হতে পারছো না? অরবিন্দকে হারিয়েছো বলে এভাবে কেন নিজেকে শেষ করে দেবে? তোমাকে যে বাঁচতে হবে এটা ভুলে যাচ্ছো কেন?

অনীতা মাথা নিচু রেখেই ফুঁপিয়ে ওঠে। বলে, আপনি ওভাবে বলবেন না। আমি অনীতা নই, সেই অনীতা মরে গেছে, যে অরবিন্দকে হত্যার প্রতিশোধ নিতে চাইতো।

তোমার কী হয়েছে সেটা তোমাকে বলতে হবে। ইমরান এক হাতে অনীতার ঘাড় ধরে ঝাঁকায়।

আমি কী বলবো বলুন?

আমাকে আবার তুমি আপনি বলছো? সব সময় বলতে আমরা বহুদিন ধরে বন্ধু- কেন সব ভুলে যাচ্ছো?

আমি তো বলছি, আমি সেই অনীতা নই।

কী হয়েছে বলতে হবে তোমাকে? ইমরান এক হাতে ঘাড় ধরে আবার ঝাঁকুনি দেয় অনীতাকে।

যদি বলি, তাহলে আপনি আমাকে ঘেন্না করবেন।

আহা তুমি বলো আগে, তারপর দেখো আমি কী করি।

আমি রেপ্‌ড হয়েছি। আমাকে চারজন লোক একের পর এক রেপ করেছে।

ইমরান পাথরের মতো স্থির হয়ে যায়। দৃষ্টি কিন্তু সরে না অনীতার মুখের ওপর থেকে। দুটি প্রশ্ন দুটি শব্দ হয়ে বের হয়- কোথায়? কারা?

অরবিন্দদের বাড়ি থেকে পায়ে হেঁটে যখন বাস ধরার জন্য যাচ্ছিলাম, তখন আমাকে ধরে টেনে নিয়ে যায় একটা ভাঙা পুরনো বাড়িতে। যেখানে...

তুমি চিৎকার করোনি?

হ্যাঁ করেছিলাম, একজনের ঘাড়ে কামড় দিয়ে রক্তাক্ত করেছি, একজনের কান ছিঁড়ে ফেলেছি।

কিন্তু আমার চিৎকার শুনে কেউ আসেনি। একজনের পর একজন। একজনের পর একজন...

ইমরান বাধা দেয়। বলে, থাক হয়েছে, আর বলতে হবে না, এবার ঘরে চলো।

তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যায় ঘরে। তারপর বলে, এখন শুয়ে ঘুমাও, কাল সকালে আমরা কোর্টে যাবো।

কোর্টে কেন? অনীতার মুখ দিয়ে তীক্ষ্ণ চিৎকারের মতো বের হয় প্রশ্নটা। সে জানতে চায়, মামলা করতে যাবো? রেপ কেসের মামলা?

না তা নয়, ইমরান আবার অনীতার ঘাড়ে হাত রাখে। তারপর বলে, কাল আমরা কোর্টে বিয়ে করতে যাবো।

কী-ই! অনীতা প্রায় চিৎকার করে ওঠে।

হ্যাঁ, ইমরান ব্যাখ্যা করার মতো বলে- ল্যাংড়া-খোঁড়া লোকের সঙ্গে তোমার সংসার করতে অবশ্যি কষ্ট হবে। কিন্তু কী করার আর, বলো? আমার যে তোমাকে খুব দরকার।

অনীতার মুখের ভাব গম্ভীরতর হয়। মাথা নাড়াতে নাড়াতে বলে, না এ হয় না- হতে পারে না- আমি আপনাকে বিয়ে করতে পারবো না।

কথা কটা বলেই সে ছুটে গিয়ে ঘরে ঢোকে এবং দরজাটা বন্ধ করে দেয়।

ইমরান দরজায় ধাক্কা দেয় আর বলে, অনীতা, দরজা খোলো- এসো আমরা খোলাখুলি কথা বলি! তুমি কি বেঁচে থাকতে চাও না? চিন্তা করে দেখো, ভালোবাসাকে বাঁচাবার জন্য অরবিন্দকে জীবনসঙ্গী করেছিলে, তাকে হত্যা করে তোমাকে নিঃসঙ্গ করা হয়েছে, তুমি হত্যাকারীদের কাছে আত্মসমর্পণ করবে? যারা তোমার চূড়ান্ত অপমান আর লাঞ্ছনা করেছে তাদের কাছেও আত্মসমর্পণ করবে? সবই তো করেছে ওরা যাতে তুমি বাঁচতে না পারো সেই জন্য- অন্তত বেঁচে থেকে তুমি প্রতিরোধ কর, তোমার প্রতিরোধের সঙ্গী গ্রহণ করো। প্রতিরোধের প্রজন্ম সৃষ্টি হোক তোমার জীবন থেকে- নিজেকে মেরে ফেলে সেই সম্ভাবনার পথ বন্ধ করে দেয়ার কোনো মানে হয়? বলো তুমি?

কতোক্ষণ ধরে একটানা ঐভাবে কথা বলে যায় খেয়াল করেনি, দেয়ালে ঘড়ি ছিলো, তবু সেদিকে নজর যায়নি। তার সমগ্র অস্তিত্বের ভেতর তখন একটাই কথা যেন বেরুচ্ছে। আর তা হলো, বাঁচতে হবে। তার অক্ষম হওয়া, অরবিন্দের হত্যা, আর অনীতার জীবনকে ধ্বংস করা একই ঘটনা- এই ঘটনার প্রতিরোধ জীবনকে বাঁচিয়ে রাখার মধ্যে। নতুন জন্মের পথ খুলে দেয়ার মধ্যে।

দরজায় ধাক্কা দিতে দিতে বারবার করে বেঁচে থাকার কথাটাই বলতে চায় ইমরান। তার কথা শুনেই কি না, বুঝতে পারে না। শেষ পর্যন্ত এক

সময় দরজাটা খোলে আর হাতে একটা ব্যাগ ঝুলিয়ে ঘর থেকে বের হয় অনীতা। বলে, আমি চলে যাচ্ছি।

ইমরান তার হাত ধরে। বলে, কোথায় যাচ্ছো?

অন্য কোথাও, মুখোমুখি তাকিয়ে বলে, আমি কীভাবে থাকবো আপনার কাছে?

অন্য কোথাও বা কীভাবে থাকবে তুমি?

যদি না থাকতে পারি তাহলে মরবো!

বেশ তো, এবার হেসে ওঠে ইমরান। বলে, তাহলে এখানেই মরো, দূরে যাবার কী দরকার? এখানেই সিদ্ধান্ত নাও, বাঁচবে? নাকি মরে যাবে? আবার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে চাও?

অনীতা মুখোমুখি তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, তবে ভেতর থেকে কান্না উদ্বেল হয়ে ওঠে আর কান্নায় সে ভেঙে পড়ে মেঝেতে।

পরের দিন তারা দু'জনে কোর্টে যায়। আর চেনা একজন উকিলকে ধরে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে দলিলে সই করে বিয়ের কাজ সম্পন্ন করে।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে বিকেল হয়ে যায়। আর বাড়িতে ফিরেই নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয় অনীতা। তারপর এক সময় নিচু গলায় বিলাপ করতে করতে কাঁদে। সারা রাত ধরে চলে তার ঐ বিলাপ আর কান্না।

ভোর হলে এক সময় আর কান্নার আওয়াজ পাওয়া যায় না। সূর্য ওঠার পর বেলা একটু বাড়লে দরজা খুলে বাইরে বের হয় অনীতা। চোখমুখ বেশ ফোলা ফোলা দেখতে লাগে। তারপর নতুন স্বামীকে বলে, আমি কিছুদিন এই ঘরেই থাকতে চাই। আলাদা আর একলা।

ইমরান কথাটা শুনে হালকা মনেই জবাব দেয়। বলে, ঠিক আছে। কোনো অসুবিধা নেই। তুমি যেমনটা ভালো বোঝো-

অনীতা কিছুদিনের মধ্যেই অনেক স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। তবে মাঝখানে একদিন এক বুড়ো ইমাম সাহেবকে বাড়িতে ডেকে এনে তার কাছে কলেমা পড়ে মুসলমান হয়।

জীবনের অতীত বারবার করে কেন স্মরণে আনে ইমরান হাসান বুঝতে পারে না। তপনকে থানা হাজত থেকে ছাড়িয়ে আনার পর থেকেই অতীতের কথা বারবার স্মরণ হয় আজকাল।

অথচ অনীতার বিদায়ের পর জীবন যাপনের ধারায় কোনোরকম রদবদল হয়নি। তিনি দুই ক্র্যাচে ভর দিয়ে ভোর সকালের দিকে একটু বাইরে বের হন। তারপর ফিরে এসে কিছু খাওয়ার পর সকাল নয়টা পর্যন্ত এক ব্যাচে তিনটি ছাত্র পড়ান- ওরা তিনজনই এসএসসি দেবে, তাই স্কুলে ক্লাস করার তাড়া থাকে না। সন্ধ্যার পর আবার এক ব্যাচ। তারাও তিনজন। এদিকে ছেলে নিয়মিত কলেজে যাচ্ছে, মেয়েও। তবে আজকাল বেশ দেরি করে যেন বাসায় ফিরছে। পার্ট টাইম চাকরি নিয়েছে, সেজন্যই হতে পারে। তবে আবার অন্য কারণেও যে হতে পারে না তা-ও বলতে পারেন না। সেদিন একটি ছেলের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে খুব অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে কথা বলতে দেখলেন মেয়েকে।

না কোনোরকম কৌতূহল প্রকাশ করেন না মেয়ের কাছে। শুধু একদিন জানতে চেয়েছিলেন ফাইনাল পরীক্ষার তারিখ দেয়া হয়েছে কি না? মেয়ের ইংরেজি লেখার দিকে যে ঝোঁক গড়ে উঠছে, সেটা তার নজরে পড়েছে, প্রায় প্রথম থেকেই। ইংরেজি কাগজের চিঠিপত্রের কলমে ওর চিঠি প্রায়ই ছাপা হয়। বেশি দূরে নয়, গলির মুখেই পত্র-পত্রিকার একটা স্টল আছে। প্রায় রোজই সেখানে গিয়ে দু'তিন খানা পত্রিকা উল্টেপাল্টে দেখেন, আর বাড়িতে তো এমনিতেই একখানা দৈনিক রাখেন। একদিকে আবার পাড়ার ছেলেরা সবাই মিলে একটা পাঠাগার খুলেছে। সেখানেও তাকে যেতে হয়। ছুটির দিন বিকেলে ওখানে গিয়ে বসেন বেশ কিছুক্ষণ। বাড়িতে রাখা কিছু রাজনীতির বই ওদের পাঠাগারে দানও করেছেন। ওসব বইয়ের কারণেই তাকে ছেলেদের প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়। যেমন কেউ হয়তো জিজ্ঞেস করলো, সোশ্যাল ইভোল্যুশন কী? কিংবা উদ্বৃত্ত মূল্য কাকে বলে? বা কেউ জানতে চাইলো ফরাসি বিপ্লব, রুশ বিপ্লব আর চীনের বিপ্লব, সবই কি একরকম? তখন তাদের প্রশ্নের জবাব দিতে হয়। দাঁড়িয়ে ওসব প্রশ্নের জবাব দেয়া যায় না- দাঁড়াতে কষ্ট হয়। তাই ওদের নিয়ে বসতে হয়। সবার আগ্রহ এক রকম থাকে না। কিছুক্ষণ শোনার পর একজন-দু'জন করে পেছন থেকে কেটে পড়তে থাকে। তবু শেষ পর্যন্ত চার-পাঁচটি ছেলে তো থাকেই।

তবে বেশ লাগে তার। ওদের সঙ্গে ঐভাবে আলাপ করতে, ওদের কৌতূহল মিটিয়ে দিতে, নতুন কিছু জানাতে আর শেখাতে। কারণ তিনি যে মনে-প্রাণে শিক্ষক!

তাঁর একটা নতুন কাজ বেড়েছে আজকাল। মাসে দুই দিন তাঁকে ডায়াবেটিক হাসপাতালে যেতে হয় রক্ত পরীক্ষার জন্য। একদিন গিয়ে রক্ত দিয়ে আসতে হয়। আর একদিন যায় রিপোর্ট আনতে। রিকশায় খরচ বেশি বলে ইত্তেফাকের মোড় থেকে বাসে ওঠেন আবার ফেরার সময় এই জায়গায় বাস থেকে নামেন। যেদিন রক্ত দিতে যান, সেদিন প্রথমে খালি পেটে রক্ত নেওয়ার পর বলা হয়, যান নাস্তা খেয়ে তার দু'ঘন্টা পরে আসুন। নাস্তা ওখানকার ক্যান্টিনেই খাওয়া হয়। তারপর কী করবেন, দু'ঘন্টা সময় কীভাবে কাটে? অন্যদের দেখেন, কেউ হেলান দেওয়া চেয়ারে বসে ঝিমুচ্ছে, নইলে কেউ অপেক্ষমাণ অন্য কারুর সঙ্গে আলাপ করছে কিংবা কেউ চোখে চশমা লাগিয়ে ঝাপসা নজরে খবরের কাগজ পড়ছে। কিন্তু তাঁর ওভাবে সময় কাটাতে মন চায় না। তাই বাইরে বেরিয়ে পড়েন। কাছেই পার্ক। তিনি ক্র্যাচে ভর দিয়ে রমনা পার্কের ভেতরে চলে যান। তারপর ঘুরে ঘুরে গাছপালা দেখেন, নইলে লেকের ধারে গিয়ে বসে থাকেন। একদিন হঠাৎ কিছুদূরে তার নজর যায়। আর দেখেন দুটি তরুণ-তরুণী গাছের ডগার দিকে তাকিয়ে কী যেন বলাবলি করছে। মেয়েটির ভাবভঙ্গি দেখে মনে মনে চমকে ওঠেন, আরে! এ তো তাঁর নীপা। ও এখানে কেন? এই সকালবেলা? ওর সঙ্গী তরুণটিকে চিনতে পারেন না। সেদিন এক রিকশায় বাড়িতে গেট পর্যন্ত এসেছিলো। এ ছেলেটি সে নয়। তার মাথাভর্তি কপালে ঝুলে পড়া চুল ছিলো, চোখে চশমা ছিলো- এর ওসব কিছুই নেই। দেখতে দেখতে তাঁর মনে খালি প্রশ্ন জাগে, এই সকালবেলা নীপা এখানে কেন? আজ ওর কলেজ নেই? আর ঐ ছেলেটাই বা কে?

লক্ষ্য করেন, দু'জনে কিছু যেন দেখে বেড়াচ্ছে নইলে খুঁজে বেড়াচ্ছে। দু'জনেরই চলনে বেশ হালকা ভঙ্গি, মাঝে মাঝে ঝোপ থেকে পাতা ছিঁড়ে নিয়ে দেখছে। নাকের কাছে তুলে ধরে শুকছেও আবার। একেকবার দাঁড়িয়ে গাছের মাথায় কী যেন দেখছে। কথা বলবার সময় হেসেও উঠছে একেকবার। দেখেন সকালবেলার রোদে ফুল পাতা আর গাছপালার মাঝখানে তাঁর মেয়েকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। দারুণ উজ্জ্বল হাসিখুশি।

না, রাগ হয় না। বরং ভালো লাগে। মেয়ের বয়স তো কম নয়। গত সেপ্টেম্বরে কুড়িতে পড়েছে। তাহলে এই বয়সে কোনো ছেলেকে মেয়ের তো ভালো লাগইতে পারে? আর ভালো লাগা ছেলেটির সঙ্গে যদি ও ঘোরেফেরে তো দোষটা কোথায়? তাছাড়া ও যে আজেবাজে ছেলেকে পাত্তা দেয় না, তা তো ভালো করেই জানেন।

সেদিনের ঐ দৃশ্য দেখার কথা মেয়েকে জানান না। দূর থেকে শুধু মেয়ের হাবভাব দেখেন। আর তাঁর মজা লাগে। মেয়ে একাকী থাকলে গুনগুন করে। তাকে গান শিখিয়েছে অনীতা নিজে। তাই কোনো কোনো দিন গলা ছেড়েও গেয়ে ওঠে। ইমরান কান পাতেন এবং সুরটা ধরতে একটুও অসুবিধা হয় না। মেয়ে গাইছে, মোর বীণা আজ কোন সুরে ওঠে বাজি-। অস্বাভাবিক কিছু মনে হয় না- কারণ ওর মায়েরও প্রিয় গানের মধ্যে ছিলো ওটি একটি। শুধু গুনগুন করা কি গান গাওয়া নয়, কোনো কোনো সময় বারান্দায় এসে দাঁড়ায় আর মুকুল ভর্তি আম গাছটার দিকে, নইলে ওপাশের গাঢ় সবুজ কদম গাছটার দিকে তাকিয়ে থাকে- আম গাছে মুকুল ফোটা শেষ। ভ্রমরের গুনগুনানি শোনা যায়। আর ওদিকে কদম গাছেরও ফুল ফোটাবার সময় হয়ে এলো, বর্ষার কি খুব একটা দেরি নেই! তখনও ভ্রমরের গুনগুনানি শোনা যাবে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে অথবা পায়চারি করে অনীতা সময় কাটাতো। ভারি প্রিয় ছিলো ওর বারান্দাটা।

হ্যাঁ, একই রকম, আগের মতোই। ভাবভঙ্গিতে কথাবার্তায় কোনো পরিবর্তন নেই মেয়ের। সবই স্বাভাবিক। ছোটভাইকে অন্যদের মতোই বকছে, অথবা তার সঙ্গে খুনসুটি করছে বা পুরনো ইজি চেয়ারে বসে ইংরেজি কবিতা সংকলনের পৃষ্ঠা ওল্টাচ্ছে, কোলারিজ আর শেলির কবিতা ওর খুব পছন্দ। টেবিলেও বই দেখেন কোনোদিন হার্ডি আর ডিকেন্স। কখনো ফিল্ডিং আর জেন অস্টেন। সব আগের মতোই, কোনো পরিবর্তন চোখে পাড়ে না। তাহলে কি ছেলেদের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করা, কি এখানে ওখানে যাওয়া, সবই ওর বাইরে বাইরে? মনের সঙ্গে ওসবের কি কোনো যোগাযোগই নেই! ইমরান হাসান ধাঁধায় পড়ে যান।

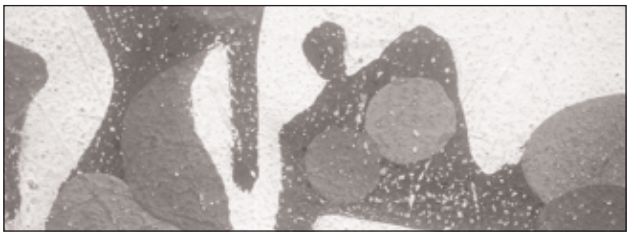

না আসলেই কোনো পরিবর্তন নেই নীপার। তার দ্বিতীয় স্টোরিটা বেরিয়েছে অল্প কিছুদিন আগে। নাম 'আমাদের গাছ গাছালি'। ভালো বা সম্পূর্ণ তথ্য জোগাড় করতে পারেনি। ছবিও যথেষ্ট দিতে পারেনি। তবু সাজেদা আপা খুব খুশি। একদিন বললেন, তোমার লেখাটা আমার বান্ধবী ইডেনের ভাইস প্রিন্সিপাল, তাঁর খুব ভালো লেগেছে। আর আজফার তো কলেজে এসে দেখা করে। মুখোমুখি হতেই বলে, এতো খবর তুমি কোথায় পেলে?

কিসের খবর? নীপা যেন বুঝতে পারে না।

বাহ্,। ঐ যে লিখেছো? অতোসব গাছপালা লতাপাতার খবর কোথায় পেলে? নীপা প্রশ্নের জবাব দেয় না। শুধু বলে, আপনি পড়েছেন? কেমন হয়েছে?

কেমন হয়েছে, সেটা কি ব্যাখ্যা করে বলতে হবে? তবে শুধু একটাই খামতি দেখলাম।

খামতি? নীপা আজফারের মুখের দিকে তাকায়। বলে, খামতি বলে তো কোনো জিনিস ও লেখায় নেই? ওটা কী জিনিস? মানে কী?

আরে কী বলো তুমি ওটা একটা শব্দ- ওটা খুব ব্যবহার হচ্ছে, আজকাল কোলকাতার লেখকরা সবাই শব্দটা ব্যবহার করছে- ওটার মানে, যাকে বলে কমতি আর কি?

ও আপনি 'ঘাটতি'র কথা বলছেন, এবার যেন নীপা বুঝতে পারে। বলে, আপনি অসম্পূর্ণতার কথা বলছেন? তার মানে লেখাটা সম্পূর্ণ হয়নি-

হ্যাঁ।

সেই জন্য খামতি? কোলকাতার লেখকরা লেখে বলে আমাদেরও লিখতে হবে? যেমন ওরা আজকাল লিখছে দেখভাল? তা খামতিটা কিসের?

আরও ফটো দেওয়া উচিত ছিলো।

তা উচিত ছিলো, নীপা স্বীকার করে। বলে, কিন্তু জোগাড় করতে পারিনি-

কেন, নিজে ফটো তুলে নিয়ে আসতে।

আমার কি ক্যামেরা আছে? আপনি পাগলের মতো কথা বলেন কেন? তাছাড়া ক্যামেরা ব্যবহার করতেও তো জানতে হবে।

সে কি! আজফার অবাক হয়। বলে, তোমার ক্যামেরা নেই?

ঐ সময় নীপার বান্ধবী দু'জন পেছনে এসে দাঁড়ায়।

ওদের দিকে ঘুরে তাকাতেই একজন মুখ টিপে হাসে। বলে, তুই তাহলে যাচ্ছিস?

হ্যাঁ, যাই, তোদের দেরি হবে?

হ্যাঁ, একটু বসবো, আমাদের তো অন্য কোনো প্রোগ্রাম নেই।

কথাটা বলে সামিনা আবার মুখ টিপে হাসে। তার হাসির খোঁচাটা নীপা ঠিকই টের পায়।

আজফারের দিকে তাকালে সে জানতে চায়, তোমার আর ক্লাস নেই?

না, নীপা বলে। তারপর জানতে চায়। কিন্তু আপনি এদিক্ কোথায়?

একটু কাজে এসেছিলাম, কোর্টে- একটা খুনের মামলায় রায় দেওয়ার কথা ছিলো- সন্ত্রাসী ব্যাপার, তো রায় হলো না- তাই ভাবলাম এদিকে এসেছি যখন-

আজফার কৈফিয়ৎটা পুরো না করে অন্য কথা শুরু করে। বলে, আচ্ছা যাক ওসব কথা, তোমার লেখাটার কথা বলি- যতোই পড়ছিলাম আর আমার অবাক লাগছিলো। পিপুল লতার কথা তুমি কোথায় পেলে, পিপুল তো বিশাল গাছ বট না কি অশথ্ যেন, বোম্বে সিনেমাতে দেখায়- তা পিপুল আবার লতাও হয়? আমি তো কখনো শুনি নি, আর ভাঁট ফুল কী জিনিস? আর পদ্মভাঁট? মেহেদী চিনি, আমরা সবাই মেন্দি বলি, কিন্তু কাঁটা মেহেদী আবার কেমন গাছ? ও গাছের পাতাও কি ঠোঁট গায়ে হাতে পায়ে লাগানো যায়? তুলসী গাছ দেখেছি, কিন্তু বন তুলসী তো দেখিনি, কোথায় পাওয়া যাবে?

একেবারে এক গাদা প্রশ্ন। নীপা নবীন সাংবাদিকের দিকে তাকিয়ে হাসে। বলে অতো প্রশ্নের জবাব এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কীভাবে দেবো? ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে, এখন তো অফিসও খোলা যাবে না- এখানে বসবেন? গাছ তলায়?

আজফার গলা উঁচিয়ে দেখে জায়গাটা, একটা গাছের গুঁড়ির চারদিক ঘিরে বেদীর মতো বানানো, তার ওপর ছেলেমেয়েরা বসে গল্প করছে। জায়গাটা এক নজর দেখে। তারপর মাথা নাড়ায়। বলে, না থাক এখানে আর বসবো না, তুমি কোথায় যাচ্ছো?

কোথায় আবার যাবো। নীপা বলে, অফিসেই যেতাম, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে। এরই মধ্যেই আপনি এসে গেলেন।

তাহলে চলো, তোমার অফিসের দিকেই যাই। দেখি, যদি আফিস খোলা থাকে।

যদি না থাকে? নীপা আজফারের চোখের দিকে তাকায়।

তাহলে ওখানেই রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করবো যতোক্ষণ অফিস না খোলে।

চলুন বরং বলধা গার্ডেনে যাই। ওখানে গাছও দেখা যাবে, কথাও বলা যাবে।

রিকশায় চেপে দু'জনে সাপ্তাহিক 'মহিলা' অফিসের সামনে গিয়ে দেখে তাদের অনুমানই ঠিক। গেটে মস্ত তালা ঝুলছে। তখন রিকশাকে সামনের দিকে যেতে বলা হয়। এবং দু'মিনিট পরই তারা বলধা গেটের সামনে নেমে পড়ে।

নীপা নিজেও সব গাছ চেনে না। তার লেখায় যেসব গাছ বা লতার উল্লেখ করা হয়েছে, সেসবের অল্প কয়টা তার চেনা, বাকিগুলো বইতে পড়া নইলে শোনা। অফিসের দারোয়ান মতি চাচার কাছে শোনা কাঁটা মেহেদী গাছের ডাল পরে সে-ই দেখিয়েছে। খুবই চেনা গাছ বাগানের ঘের দেওয়ার জন্য ঐ গাছ লাগানো হয়। ঢাকা শহরের অনেক বনেদী বাড়িতেই দেখা যায়। পিপুল লতার লম্বা সরু সরু মরিচের মতো কালচে সবুজ ফল মতি চাচাই দেখিয়েছে তার নেত্রকোনা দেশের বাড়ি থেকে এনে। ঐ ফল নাকি গরম পানিতে ভিজিয়ে রেখে গলা ব্যথার জন্য খাওয়া হয়- পরে হর্টি কালচারাল সোসাইটির ম্যাগাজিনে দেখলো, ছবিসুদ্ধ পরিচিতি, শুকনো ফলের গুঁড়োটাই খাবার টেবিলের ঝাল বা পেপার। মতি চাচাই একদিন থোঁকা বাঁধা পদ্মভাটের একটা চাক এনে দিয়েছিলো নীপার হাতে। ওর কাছ থেকেই জেনেছে যে পদ্মভাট সাধারণ ভাট থেকে আলাদা। সাধারণ ভাট গাছ সাইজে ছোট তার পাতাও ছোট- যেখানে জন্মায় সেখানে জঙ্গলের মতো হয়ে যায়। লোকে বলে ভাঁটির জঙ্গল।

হাঁটতে হাঁটতে আর লতাপাতা গাছ

দেখতে দেখতে একটু জিরিয়ে নেবার জন্য এক বেঞ্চে দু'জনে পাশাপাশি বসে। তারপর আবার হাঁটতে শুরু করে গেটের কাছ থেকে আজফার চীনা বাদাম ভাজা নিয়ে আসে তারপর কিশোর বয়সী ছেলেমেয়েদের মতো চীনাবাদাম খায় আর হাঁটে, আর কথা বলে, আর হাঁটে। একটা পুকুরে দেখে চারদিকে পানা ভাসলেও মাঝখানে ভেসে আছে প্রকান্ড ঢালের মতো আমাজন লিলির পাতা। ঐ পুকুরে নীল হয়। মতিচাচা জানিয়েছে, কিন্তু নীপা খুঁজে পায় না। নীপাই ছালবাকল ওঠা গুঁড়ি আর ডাল সুদ্ধ ভূর্জপত্রের গাছটা দেখায় আজফারকে। বলে, ঐ যে বাকলগুলো দেখছেন ওগুলো লেখার কাগজের মতো ব্যবহার করতেন প্রাচীনকালের মুনি ঋষিরা। বেদ আর পুরাণ কাহিনী প্রথমে ঐ ভূর্জপত্রেই লেখা হয়। নীপার কথা শুনে আজফারের দু'চোখ কপালে ওঠার উপক্রম হয়। বলে, তুমি এতোসব কোত্থেকে জানলে? কোন বইতে আছে এসব, আমিও পড়বো বইটা।

নীপার মুখে তখন করুণ হাসি ফোটে। বলে, স্বাতীর দাদুর কাছে এসব শুনতাম, উনিই চিনিয়েছেন ঐসব গাছপালা- এক স্কুলে একই ক্লাসে পড়তাম আমরা। বাড়ি ছিলো কাছাকাছি, দাদু স্বাতীকে নিয়ে এখানে আসতেন, আমিও সঙ্গে আসতাম- এসব গাছপালার পরিচয় তাঁর কাজ থেকেই আমি জেনেছি।

সেদিন অনেকক্ষণ দু'জনে একসঙ্গে কাটায়।

আর দিন দুই পরে অচেনা এক অল্পবয়সী ভদ্রলোক এসে নীপা হাসানের খোঁজ করে। বেয়ারা তাকে নীপার টেবিলে নিয়ে আসে। ভদ্রলোক নিজের নাম বলেন, ওয়াসিম হায়দার। ডাক নাম অসীম। ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি থিসিস করছেন। সেখানে লেকচারারও- সাপ্তাহিক মহিলা পত্রিকায় নীপা হাসানের লেখা পড়ে তার খুব ভালো লেগেছে। তাই দেখা করতে এসেছেন- ময়মনসিংহে কাজ করলেও তার আসল বাড়ি ঢাকা শহরে মোহাম্মদপুরের দিকে।

অসীমকে বসতে বলা হলে সে বলে, আমার কৌতূহল দূর্বাঘাস কয় রকমের? সব দূর্বার থেঁতলানো পাতাই কি ক্ষতস্থানের রক্তপাত বন্ধ করতে পারে? কোন গাছের ফল খেলে ডায়াবেটিস রোগীদের ডায়াবেটিস কমায়? হরতকি না মেহগনি? কোন শাক রক্ত পরিষ্কারক? কলমী না হেলেঞ্চা? সে জানায়, আমি আসলে হারবাল প্ল্যান্ট সম্পর্কে জানতে চাই।

নীপা বলতে গেলে কোনো প্রশ্নেরই জবাব দিতে পারে না। তার যে আসলেই গাছগাছালি সম্পর্কে একাডেমিক কোনো জ্ঞান বা পড়াশোনা নেই, তা সে অকপটে জানিয়ে দেয়। বলে, আমি দুঃখিত, আপনাকে কিছু বলতে পারলাম না।

অসীম ঠিক আছে, ঠিক আছে বলে উঠে দাঁড়ায়। বলে, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

কিন্তু নীপা তাকে বসায়। বলে, আপনি বলুন, আমি একটু কথা বলি আপনার সঙ্গে।

আসলে কথা বলার ব্যাপারটা ছুতো। তার মন তখন অতিথিকে চা খাওয়াতে চাইছে। চায়ের কথা বলা হয় বেয়ারাকে। তারপর এলোমেলো কথা হয়। অসীমরা আদিতে পশ্চিমবাংলার লোক, বীরভূমে ছিলো ওদের বাড়ি। ওর দাদা পার্টিশনের পরে পাকিস্তানে চলে আসেন। বাবা ল' ইয়ার ছিলো, পাকিস্তান আর্মি তাঁকে গুলি করে মারে দাদা বেঁচে থাকতেই। তারপর দাদার কাছেই ওরা দু'ভাই মানুষ হয়েছে।

বলতে চায় না, নীপা তবু খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে আর জানে। সে ভেবে পায় না। ছেলেটার সঙ্গে কথা বলতে তার কেন অতো ভালো লাগছে। পারিবারিক বিষয় নিয়ে আলাপের মধ্যে সে নিজের কথাও বলে। তার বাবার খোঁড়া হওয়ার কথা, মা মরে যাওয়ার কথা, তার ছোট ভাইয়ের কথা কিছুই বাদ থাকে না। কাপের চা কখন ফুরিয়ে গেছে সে খেয়াল দু'জনের কারুরই থাকে না। তারপরও কথা হয়। গাছপালার সম্পর্কে নিজের কৌতূহলের কথা সে জানায়। বলে, আচ্ছা মাদার গাছই কি মন্দার গাছ? ছাতিম ছৈতন আর সপ্তপর্ণী কি একই গাছ নাকি আলাদা আলাদা? ঐ গাছের পাতা প্রত্যেক ডগায় কি সাতটাই থাকে? কবরী আর কল্কে কি একই ফুলের নাম? মহুয়া গাছের ফুল কি থোকা বেঁধে ফোটে? না আলাদা আলাদা ফোটে।

অসীম প্রায় সব প্রশ্নেরই জবাব দিয়ে দেয়। জানায় মন্দার মাদার একই গাছ, লালফুল ফোটে। সপ্তপর্ণী গাছের পাতা সাতটাই থাকে এক সঙ্গে। তাই নাম সপ্তপর্ণী- হ্যাঁ ছাতিম ছৈতন ঐ সপ্তপর্ণীরই আঞ্চলিক নাম- রমনা পার্কে অনেক গাছ লাগানো আছে। মাদার, মহুয়া, ছাতিম সব ওখানে দেখা যায়। ওখানে শ্বেত আর রক্ত দু'রকমের কবরীই দেখা যাবে, না কল্কে ফুল আলাদা হাইকোর্টের পাশের লনে দু'তিন রঙের কল্কে ফুলের গাছ আছে।

দু'জনের গল্প যেন ফুরোতে চায় না, আর প্রথম আলাপেই বন্ধুত্ব হয়ে যায়। নীপার জীবনে এমন ঘটনা কখনো ঘটেনি। প্রথম আলাপেই বন্ধুত্ব তাও অচেনা এক যুবকের সঙ্গে।

তারপর মহা উৎসাহে তারা গাছ দেখে বেড়ায় ক'দিন প্রেস ক্লাবের মোড়ে দু'জনে মিলে, তারপর হাঁটতে হাঁটতে এক একদিন এক এক দিকে। কার্জন হলের বাগানে মেহগনি গাছে আতাফলের মতো সাইজের ফল দেখে, হাইকোর্টে দেখে নীল রঙের কল্কে, সেই সঙ্গে হলুদ আর লালও। দুই সপ্তাহের মধ্যে তারা চার দিন গাছ দেখে বেড়ায়। শুধু আনন্দ নয়, নীপার বাড়তি লাভও হয়।

হাইকোর্ট বা কার্জন হল কিংবা রমনা পার্কে এসব এলাকায় ফুটপাতের ওপর ঝুপড়ি বেঁধে যারা কাজ করে তাদের সম্পর্কে নানান তথ্য যোগাড় করে ফেলে সে। তার মানে সাপ্তাহিক মহিলাতে তার নতুন একটা স্টোরি ছাপার ব্যবস্থা সে ঐ ফাঁকে করে ফেললো।

ওরই মধ্যে আজফার নীপাকে খোঁজে, কিন্তু নাগাল পায় না, অফিসের টেলিফোনে বিকেলে না সন্ধ্যায়ও না। জবাব পায়, সম্পাদকের কাছ থেকে যে নীপা বাসায় এখনো আসেননি। নইলে অফিসের অন্যলোক বলে, উনি তো এইমাত্র চলে গেলেন, কাল দুপুরে ফোন করুন, তখন পাবেন। কলেজে গিয়েও পায় না। গেলে জানতে পারে যে ফাইনাল ইয়ারের ক্লাস এখন খুব কম হয়। সামনে পরীক্ষা, তাই ছাত্রছাত্রী কম আসে, ফর্মফিলাপ তো হয়ে গেছে। শেষে একদিন বাসায় গিয়ে হানা দেয় আজফার। ওর বাবা জানান, নীপা নাকি ফরিদাবাদের শ্মশানঘাটের মন্দিরে গেছে, চাঁপাফুলের গাছ দেখতে।

সব সুদ্ধ তিন সপ্তাহ। অসীম তিন সপ্তাহের ছুটি নিয়ে এসেছিলো। সাধারণত ও কম আসে। দাদু নেই, মা নেই, ভাই বিদেশে চাচা-চাচী আর তাঁদের ছেলেমেয়েরা আছে। কিন্তু অসীমের ভালো লাগে না। আগে কখনও তিন সপ্তাহ থাকেনি, এবারই সে তিন সপ্তাহ থেকে গেছে। একদিন ওদের বাড়িতে নিয়ে যেতে চেয়েছিলো, কিন্তু নীপা যায়নি, পাশ কাটিয়েছে। আর অসীমও পীড়াপীড়ি করেনি। কারণ যেখানে মা বাবা নেই, সেখানে সে কার কাছে নিয়ে যাবে নতুন পরিচয়ের মেয়েটিকে?

কিন্তু তবু নীপার অবাক লাগে, মাত্র তিন সপ্তাহের পরিচয়, এক সাথে ঘোরাঘুরি করেছে খুব জোর চারদিক কি পাঁচদিন, তাতেই কি সম্পর্ক তৈরি হয়ে যেতে পারে? ঘনিষ্ঠতা বাড়াবার জন্য অসীম কিছুই করেনি। এক রিকশায় পাশাপাশি বসে গেছে শহরের একদিক থেকে আর একদিকে, কিন্তু কখনো তার ঘাড়ে হাত রাখেনি বা হাত ধরেনি যা আজকাল ছেলেদের মধ্যে অনেকেই করে। যদি অমন কিছু করতো, তাহলে সে যে খুব বিরক্ত হতো, কি রেগে যেতো, না হয়। তবু ওর আচরণ সে লক্ষ্য না করে পারেনি। ওদের বাড়িতে নিয়ে যাবার প্রস্তাবটা সে বুঝতে পারেনি। মনে হয়েছিলো ও ঘনিষ্ঠতা বাড়াতে চাইছে। কিন্তু পরে দেখেছে তার ধারণা ভুল। বাড়িতে মা-বাবা, ভাই-বোন কেউ নেই। সে বাড়িতে গেলে কি ঘনিষ্ঠতা বাড়তো? ধানমন্ডি লেক থেকে ওদের বাড়ি খুবই কাছে, তাই সে প্রস্তাবটা করেছিলো, বোধহয় বাড়িটা চেনাতে চেয়েছিলো- ঘনিষ্ঠতা বাড়ানোর ইচ্ছা থাকলে তো ও আরও কিছু করতে পারতো।

ঐ সময় একদিন সন্ধ্যার দিকে বাড়িতে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে বাবা জানালেন যে আজফার এসে অনেকক্ষণ বসে ছিলো, তারপর এই অল্প আগে সে বেরিয়ে গেছে। যাবার সময় বলে গেলো, ও কাল সকালে একটা

ডেলিগেশনের সঙ্গে শ্রীলঙ্কা যাচ্ছে- সাউথ ইন্ডিয়া হয়ে তারপর ফিরবে- তাই যাবার আগে দেখা করতে এসেছিলো। অনেকদিন ধরে তোমার সঙ্গে নাকি ওর দেখা হয় না।

নীপা বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে খবরটা শোনে শুধু, মুখ দিয়ে কিছুই বলে না। যেন খুবই স্বাভাবিক একটা খবর, নিত্যদিনের ঘটনা।

বাইরের কোনো ডাকাডাকি নেই, তাই মন আপনা থেকে গুটিয়ে আসে। সে লেখাপড়ায় মন দেয়। বইপত্র নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি চলে, নোট কপি করা যায়, কোটেশন মুখস্থ করা চলে, তারপর পুরনো প্রশ্ন মিলিয়ে মিলিয়ে বাছাই করা হয়- বাড়িতে কাজের মধ্যে এসব। আর বাইরে গেলে ডিপার্টমেন্টের সেমিনারে বসে সহপাঠীদের সঙ্গে আলাপ করে কী রকম কে তৈরি হচ্ছে পরীক্ষার জন্য, তাই নিয়ে। তবে বেশিক্ষণ না, কারণ সহপাঠীদের মধ্যে মাত্রই দু'চারজন আসে।

কলেজ থেকে বেরিয়ে রোজকার অফিস। সেখানে কিছুক্ষণ কাজ শেষে তারপর সোজা বাসায়। সাজেদা আপাকে সে জানিয়ে দিয়েছে যে ফিল্ড ওয়ার্কের রিপোর্টিং আপাতত সে করতে পারবে না, কারণ তাকে পরীক্ষা দিয়ে পাস করতে হবে। তবে সে কথা দিচ্ছে, পরীক্ষা শেষ হলেই সে নতুন একটা স্টোরি করবে। সেটা হবে ফুটপাতের বাসিন্দাদের নিয়ে। সম্পাদক সাজেদা আকরাম নীপা হাসানের সব আবদারই মেনে নেয়ার জন্য তৈরি। কারণ এমন একটি প্রতিভাবান মেয়েকে তিনি হাতছাড়া করতে চান না। এ পর্যন্ত যে কয়টা ফিল্ড রিপোর্টিং করেছে, প্রত্যেকটাতে ক্রিয়েটিভিটির ছাপ আছে। যে পড়েছে প্রশংসা না করে পারেনি।

তাই কয়েকটা দিন টানা পড়াশোনা নিয়েই কাটে নীপার। তবে মাত্র ঐ কয়েকটা দিনই। তারপরই কেমন যেন নিঃসঙ্গ লাগতে আরম্ভ করে। অফিসে বসে থাকার সময় তার মন অপেক্ষা করে, কারুর যেন আসবার কথা ছিলো কিংবা হয়তো এক্ষুণি টেলিফোন করবে। সে ফোনের দিকে ঘন ঘন তাকায়। মনে হয় এক্ষুণি কেউ তাকে ফোন করবে। এও মনে হয় যে যদি কেউ ফোন করে তো অসীমই ফোন করবে। আজফার কীভাবে করবে অতোদূর সেই শ্রীলঙ্কা নয়তো ত্রিবেন্দ্রাম বা চেন্নাই থেকে? আর সহপাঠী বন্ধু-বান্ধবীরা তো এখন এমনিতেই ফোন করবে না। ফোনে খোশগল্প করার সময় কোথায়? সামনে পরীক্ষা না?

সে বুঝতে পারে না মনের মধ্যে অপেক্ষার ভাবটা কেন জাগছে? আজফারের সঙ্গে দেখা হচ্ছে না বলে? নাকি অসীমের সান্নিধ্য চাইছে তার মন? দু'জনকেই তার মনে পড়ছে, তবে অসীমকে বেশি। কেন, তাও সে বুঝতে পারে না। এরই নাম কি অনুরাগ? তাহলে অসীম কেন? আজফারের সান্নিধ্য চাওয়ার কথা আগে। তবে অসীমই যদি তার মনে অনুরাগ জাগানোর কারণ হয়, তাহলে আজফারের কথা মনে আসে কেন? সে গোঁজামিল দিয়ে মনকে বোঝায় যে ব্যাপারটা অনুরাগ নয়, আর ভালোবাসা তো নয়ই। ভালোবাসা হলে তো বিয়ের কথা উঠবে। তার মানে সারা জীবনের কথা চলে আসবে। কিন্তু সে তো দু'জনের কাউকেই ভালো করে চেনে না। ওদের বাড়ির লোকজন কেমন, ওদের নিজেদের চরিত্র কেমন, অন্য মেয়ের সঙ্গে অতীতে এ্যাফেয়ার ছিলো কিনা আর মন মেজাজ সম্পর্কেও তো কোনো ধারণা নেই তার। সামনা সামনি বসে কিংবা ঘুরতে ফিরতে যেমন ভদ্র নরম আর কোমল দেখায়- ওরা কি আসলে তাই? যদি মন মেজাজের ব্যাপারটাই জানা না থাকে তাহলে ভালোবাসার ব্যাপারটা কী ভাবে আসে।

নিজের মানসিক অবস্থার ব্যাপারটা বুঝে নেয় যে মেয়েদের বয়স হলে পুরুষ মানুষের ব্যাপারে তাদের কৌতূহল জাগে। সে জন্যেই তারা পুরুষ মানুষের ব্যাপারে খুব সচেতন হয়ে ওঠে, নিজেকে তাদের নাগালের বাইরে রাখতে চায়। কিন্তু সবার নাগালের বাইরে নয়, দু'একজনের কাছে যেতে তাদের মন চায়। এখন তার মনের অবস্থা ঐ রকম পুরুষ মানুষের সান্নিধ্যে যেতে চায় তার মন- কিন্তু কোন জনের সে নিশ্চিত হতে পারে না। আর তাই তার মন অপেক্ষা করে থাকে।

তার মনের যখন ঐ অবস্থা তখন একদিন বিকেলে দু'জন ভদ্রলোক আর একজন মহিলাকে বাড়ির গেটের সামনে গাড়ি থেকে নামতে দেখা যায়। গেট পার হয়ে ভেতরে এসে তাঁরা পরিচয় দেন যে একজন আজফার হুসাইনের চাচা আর অন্য দু'জন ফুপা ফুপু। মহিলাটি জানান যে তারা শুধু বেড়াতে এসেছেন আর একটু আলাপ পরিচয় করবেন আর কি? তাঁর ভাইপো আজফার হুসাইন ইমরান হাসান সাহেব আর তাঁর মেয়ের কথা খুব বলে তাই কৌতূহলবশত আসা, শুধুই দেখা করতে, অন্য কিছু নয়।

ওঁদের বসার ঘরে আনা হয়। ক্র্যাচে ভর দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ইমরান সাহেবই সমাদর করে ঘরের ভেতরে আনেন। পুরনো ভাঙা আর ময়লা সোফায় তাঁরা বসেনও এবং নিজেদের মধ্যে কথা বলতে শুরু করে দেন। ওদিকে নীপাকে চা বিস্কুটের ব্যবস্থা করতে হয়। ওঁরা কেন এসেছেন সেটা বুঝতে বাবার যেমন অসুবিধা হয় না, তেমনি মেয়েরও না।

বেশ অন্তরঙ্গভাবেই পারিবারিক খবরাখবর দেওয়া নেওয়া হয়। আজফারদের বাড়ি এখন ধানমন্ডি হলেও ওদের আদি বাড়ি ছিল মুর্শিদাবাদ জেলার সালার এলাকার গ্রাম মধুপুরে। খুবই বনেদী পরিবার তাঁদের, সৈয়দ বাড়ির নাম ও এলাকার মানুষ এখনও স্মরণ করে। কিন্তু তাতে লাভ কী বাড়িঘর জায়গাজমি ফেলে যে পালিয়ে আসতে হয়েছিলো, সেটা তো ভোলা যায় না। আল্লার রহমতে এখন সৈয়দ বংশের লোকেরা সবাই মোটামুটি দাঁড়িয়ে গেছে। সবাই ব্যবসায়ে আছে শুধু আজফারটাই কীভাবে যেন ছিটকে বেরিয়ে গেছে। উকিল ব্যারিস্টার হলেও পারতো, কিন্তু ওদিকেও গেলো না।

ঘরের চারদিকে তাকাতে তাকাতে সৈয়দ আজগর বলেন, আপনাদের বাড়িটা দেখে তো মনে হচ্ছে খুব প্রাচীন আর বনেদী বংশের লোক আপনারা, তা কোথায় বাড়ি ছিলো আপনাদের? যশোর শহরে না গ্রামের দিকে, নিশ্চয়ই এক সময় জমিদারি ছিলো আপনাদের।

ভদ্রলোকের কথা শুনে ইমরান হাসান হেসে ওঠেন। বলেন, আপনারা নিজের মতো সবাই কেন যে ভাবেন, বুঝি না- আমরা জমিদার নই। বনেদী নই, আমাদের নাম বললে যশোরের কোনো লোকই চিনবে না। শহরে আমাদের একটা ভাঙা বাড়ি ছিলো ঐ বাড়িটা বিক্রি করে আমার ইস্কুল মাস্টার বাবা ঢাকা শহরে এই পুরনো বাড়িটা কিনেছেন। ভাঙাচোরা, তবু বসবাস করা যায়। তাই করছি-

বেশ টানা আর দীর্ঘ বয়ান দেন ইমরান হাসান আর অতিথিরা ও- ও, তাই বুঝি, ঠিকই তো- তাহলে তো সমস্যাই বলতে হবে- এসব শব্দ আর বাক্য মাথা দোলাতে দোলাতে উচ্চারণ করেন।

ওদিকে ট্রেতে করে চা বিস্কুট এনে অতিথি আপ্যায়ন করার পরও নীপা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলো। তাকে এভাবে দেখে হঠাৎ যে কী হয় মহিলার, বোঝা যায় না। সোফা থেকে উঠে গিয়ে তিনি দুহাতে মেয়েকে জড়িয়ে ধরলেন, তারপর সবার দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন, আমরা মেয়ে দেখতে আসিনি, আর সাজিয়ে গুজিয়ে আমাদের মেয়ে দেখানোও হচ্ছে না- তাই আমরা এ বাড়িতে মেয়ে দেখতে আসবো না, আমাদের আসার দরকার হবে না- আমরা একেবারে বরযাত্রী হয়েই আসবো।

তিন অতিথিই এক সঙ্গে হাততালি দিয়ে উঠলেন। ছেলের চাচা সৈয়দ আজগর হুসাইন বলেন, এখন শুধু তারিখটা ঠিক হলেই পরে সমস্যা থাকে না।

ভদ্রলোক ইমরান হাসানের হাত ধরে বলেন, তা কবে তারিখ হচ্ছে বেয়াই সাহেব? একটু আভাস দিন প্লি-ই-জ!

ইমরান মেয়ের মুখের দিকে এক নজর তাকিয়ে দেখেন। তারপর বলেন, আপনারা এমন, আপনারা এমন নাটকীয়ভাবে আমার মেয়ের বিয়ের কথা বলতে আসবেন, আমি কল্পনাও করতে পারতাম না। কিন্তু আপনারা কল্পনার নাটককেও হার মানিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আপনারা ব্যাপারটা যেভাবে দেখছেন আর ভাবছেন আমরা সেভাবে দেখছি না, আর ভাবছিও না। আসলে আমরা এখন মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধে কথা বলার জন্য তৈরি নই। মাসখানেকের মধ্যেই মেয়ের এমএ ফাইনাল পরীক্ষা। ওর পরীক্ষা হয়ে গেলে তখন আমরা ভেবে দেখবো- আপনাদের ছেলের কি আমার মেয়েকে

পছন্দ হয়েছে?

ভাই সাহেব কী যে বলেন আপনি! আজফারের ফুফু বলে ওঠেন। পছন্দ হয়েছে মানে? ছেলে তো পাগল। বিদেশে যাবার সময় বলে গেছে আপনার সঙ্গে দেখা করে কথা বলতে। এখন দু'দিন তিন দিন পরপরই ফোন করছে। ওর ওই ফোনের তাগিদেই আসা। এসে তো আমাদেরও মনে হচ্ছে, মেয়ে তো নয়, যেন মানিক রতন।

ইমরান সাহেবের কানে সব কথা যায় কি না বোঝা যায় না। তিনি মেয়ের স্থির আর গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। মহিলার কথা শেষ হবার আগেই বলে ওঠেন, আমার কথা শুনুন দয়া করে, আমার মেয়েকে আপনার ছেলের পছন্দ হয়েছে, আর সেটা আপনাদের জানিয়েছে বলে আপনারা এই গরিবের বাড়িতে পদধূলি রেখেছেন এবং বিয়ের প্রস্তাবও দিতে চাইছেন, কিন্তু আমার মেয়ে এখনো আমাকে জানায়নি যে সে আপনাদের ছেলেকে পছন্দ করেছে- তাই আমি ওর বিয়ের ব্যাপারে এখন কিছু বলতে পারছি না। তাই আমি দুঃখিত- অনুরোধ, সামনে ওর পরীক্ষা, ওর পরীক্ষা শেষ হোক, তখন কথাবার্তা বলা যাবে।

বাবার কথা শেষ হবার আগেই নীপা বসার ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। গোটা ব্যাপারটা তার কাছে ধাঁধার মতো লাগে। আজফারের সঙ্গে পরিচয়, না হলেও পাঁচ ছ'মাসের তো হবেই- দু'জনে একসঙ্গে ঘুরেছে ফিরেছে, কিন্তু একবারও কেন সে নিজের মনের কথাটা প্রকাশ করেনি, আর বিদেশ থেকে টেলিফোন করে চাচা ফুফুকে পাঠিয়েছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে। ব্যাপারটা ভীষণ গোলমেলে লাগে তার কাছে। নিজের মুখে বলতে কী অসুবিধা ছিলো?

অতিথিরা চলে যাবার পরও অনেকক্ষণ ধরে বাবা চুপ। নীপা সামনে গেলে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন, কী দেখেন তিনিই জানেন।

এক সময় সে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করে, বাবা, তুমি কথা বলছো না কেন?

ইমরান নিস্পৃহ ভঙ্গিতে বলেন, কী বলবো, বলো?

ওঁদের তুমি শেষ পর্যন্ত কী বললে?

ঐ তো, তোমার সামনেই তো বললাম যে মেয়ের পরীক্ষা সামনে, এখন বিয়ের ব্যাপারে কোনো কথা বলতে পারবো না- ওর পরীক্ষা হয়ে যাক, তারপর ও ব্যাপারে কথা বলতে পারবো। কেমন ঠিক বলিনি? ইমরান মেয়ের মুখের দিকে তাকান।

নীপার মুখে কোনো ভাবান্তর নেই- মুখখানা গভীরই থাকে। বলে, না বাবা, স্পষ্টভাবে বলা উচিত ছিলো যে, এমএ পাস করলে তারপর ওর বিয়ে হবে।

যতোক্ষণ অতিথিরা ছিলো ততক্ষণ সে চুপচাপ থেকেছে। শীতল আর গম্ভীর হয়ে ছিলো সারাটা সময়। কিন্তু কেন? অতিথিরা চলে যাবার পর, নিজের ঘরে একাকী হলে তার মনে প্রশ্ন জেগেছে। ওদের আচরণে তো অস্বাভাবিক কিছু ছিলো না। ছেলের বিয়ে দেওয়ার জন্য মানুষ মেয়ে দেখে বেড়াবে না? আর ছেলেপক্ষ যখন আসবে তখন তাদের আপ্যায়ন করে মেয়ে দেখাতে হবে, এটাই তো স্বাভাবিক। এতে রাগই বা কেন হবে, আর বিরক্তিও বা কেন লাগবে? যাবার সময় আজফারের ফুফু জানিয়ে গেলেন যে, আজফারকে টেলিফোন করে সব কিছু জানানো হবে, আর তাতে যদি সে আবার আসতে বলে, তো তাঁরা আবার আসবেন।

নীপা সেদিন রাতের বেলা পড়ায় মন বসাতে পারে না। কেবলই মনে হয়, তার বিয়েটা কি খুব শিগগিরই হয়ে যাবে? তার পরীক্ষা শেষ হবার পরপরই! তাহলে বিয়ের পর তাকে কী করতে হবে? তার কী কাজ? বাসর রাত থেকেই তো বিয়ে শুরু। বাসর রাতে নাকি অনেক কান্ড ঘটে, কী কান্ড সে সব। তার সবগুলো জানা থাকলেও কিছু কিছু তার শোনা আছে, বিয়ে হওয়া বান্ধবীর কাছ থেকেই সে শুনেছে- ঐসব কান্ডের কথা যেমন মনে পড়ে। একই সঙ্গে এও মনে পড়ে যে একজন পুরুষ মানুষের সঙ্গে তাকে সারাটা জীবন যুক্ত হয়ে থাকতে হবে, দেহ মন চিন্তা ভাবনা সমস্ত কিছু নিয়ে তার গর্ভে সন্তান আসবে। তার নিজের একটা সংসার হবে, যেমন তার মায়ের হয়েছিলো। সেই সন্তানদের মানুষ করতে হয়। কিন্তু তারপর? তারপর কী হয় বিয়ের চূড়ান্ত পরিণতিতে- পরিণতিতে তো মৃত্যু- যেমন তার মায়ের হয়েছে, কিন্তু তারা সন্তানরা তো বেঁচে আছে, তাহলে বিয়ে মানেই মিলন আর নবজন্ম। এ তো সবার বেলাতেই সত্য, সুতরাং নতুন কিছু কেন সে খোঁজার চেষ্টা করছে। ঐসব ভাবতে ভাবতেই সেক্সের কথা মনে হয়। তার জানতে ইচ্ছে করে, সেক্স করার সময় কেমন অনুভূতি জাগে মেয়েদের। বিয়ে হওয়া ঘনিষ্ঠ বান্ধবীদের দু'একজনকে সে জিজ্ঞেস করেছিলো, কিন্তু জবাব পায়নি। লাজুক হাসি হাসতে হাসতে বলেছিলো, ওটা এক্সপিরিয়েন্সের ব্যাপার, ভাষায় বোঝানো যাবে না। বিয়ের পর যখন সেক্স করবি তখন নিজেই ফিল করতে পারবি- ইট্স এ থ্রিলিং এক্সপিরিয়েন্স বোথ ফিজিক্যাল এ্যান্ড মেন্টাল।

তাহলে কি আমি দেহ মন দু'দিক থেকেই বিয়ের জন্য তৈরি? সে নিজেকে জিজ্ঞেস করে। আবার পরক্ষণে মনের ভেতরে প্রশ্ন লাফিয়ে ওঠে, কার সঙ্গে বিয়ে। কে হবে তোমার সারাজীবনের সঙ্গী? আজফার? নাকি অসীম? নাকি অন্য কেউ, যাকে সে চেনে না, এখনও দেখেনি!

পরের দিনই অফিসে থাকার সময় সে অসীমের টেলিফোন পায়।

আমি অসীম বলছি!

শব্দ কটা কানে আসার সঙ্গে সঙ্গে নীপা এদিক থেকে ক্ষুব্ধ স্বরে বলে ওঠে, আমি ঠিকই চিনতে পারতাম, নাম বলার দরকার ছিলো না- তা হঠাৎ কী মনে করে, এতোদিন পর?

আপনি কেমন আছেন জানবার জন্য টেলিফোন করছি, অসীম জানায়। বলে, আপনি কেমন আছেন?

আমি খুব ভালো আছি, নীপা উত্তর দেয়। বলে, আনন্দে আছি, সুখের সাগরে অবগাহন বোঝেন? আমি তাই করছি- আর কিছু জানতে চান?

আপনি কি আমার ওপর রেগে আছেন? অসীমের প্রশ্ন।

না, আমি আপনাকে ভালোবেসে ফেলেছি, নীপা উত্তরে বলে, শুনছেন না কেমন গলায় আদর ঢেলে কথা বলছি, বুঝত পারছেন না?

না পারছি না। দুঃখিত, আমাকে ক্ষমা করে দেবেন। অসীম রেগে যায় এবং লাইন কেটে দেয়। আর তাতে নীপা অবাক হয়, অসীম তাহলে রেগে যেতেও পারে? নাকি লোকটা অসীম নয়, অন্য কেউ?

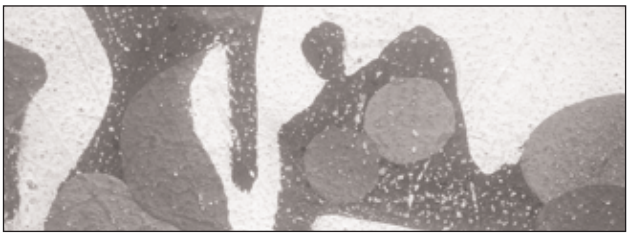

নীপা চিন্তা করে দেখে, সে নিজেই নিজেকে আজকাল বুঝতে পারছে না। অসীমের সঙ্গে সেদিন টেলিফোনে ওভাবে কথা বলার কোনো মানে সে পরে আর খুঁজে পায় না। তাহলে কি সে বদলে যাচ্ছে? মন মেজাজ, ভাবনা চিন্তা সব কি অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে? যদি তাই হয়, তাহলে তার কারণ থাকবে না? এ কেমন বদলানো? অসীম তো কখনোই তার সঙ্গে খারাপ বা রূঢ় বা অভদ্র ব্যবহার করেনি? তার কোনো দোষই সে আবিষ্কার করতে পারে না। তাহলে তার মনে সেদিন কেন অমন একটা হিংস্র ভাব জেগে উঠেছিলো! গলার স্বরে শ্লেষ বিদ্রূপ আর জ্বালা ফুটে বের হচ্ছিলো?

নাকি ওটা আসলে রাগ নয়, অভিমান? তার মনে কি তাহলে অভিমান জেগে উঠেছিলো তখন? তারও সে যুক্তি খুঁজে পায় না। কারণ, অভিমান তো হয় আপনজনের ওপর? অভিমানের জন্ম ভালোবাসা থেকে? তাহলে অসীম কি তার আপনজন? তার ভালোবাসার মানুষ? তিন সপ্তাহে পাঁচ ছয়বার বাগানে বাগানে দু'জনে গাছ দেখে বেড়ালেই কি একে অন্যের আপন হয়

যায়? দু'জনের মধ্যে ভালোবাসা জেগে ওঠে? আর তাতে একজনের অন্যজনের ওপর অভিমানও হতে পারে?

টেলিফোনে কথা হবার দিন দুই পরে বিকেল বেলা বাড়িতে ফিরে দেখে অসীম বসার ঘরে বাবার সঙ্গে পাশাপাশি বসে গল্প করছে।

নীপাকে আসতে দেখে বাবা উঠে পড়েন। বলেন, নাও এবার তোমরা দু'জনে কথা বলো, আমি ঘরে গিয়ে কিছুক্ষণ বিছানায় গড়াই।

কথা বলবে কী? নীপার মেজাজ অসীমকে দেখেই তখন সপ্তমে চড়ে গেছে। কোনোরকম ভদ্রতার ধার সে ধারে না তখন। সোজাসুজি জিজ্ঞেস করে, আপনি এখানে? হঠাৎ? কেন এসেছেন?

না, তেমন দরকারি কিছু নয়। মানে- এমনি আর কি, দেখা করতে এলাম- মানে কেমন আছেন টাছেন। মানে-

থাক, মানে মানে করে ম্যানম্যান করতে হবে না। সেই যে গেলেন, তারপর কোনো ট্রেস নেই। ময়মনসিংহ কি ঢাকা থেকে খুব দূর? পোস্টকার্ডে দুটো লাইন লেখা যেতো না? আমার বাসায় টেলিফোন নেই, কিন্তু অফিসে তো আছে?

হ্যাঁ, আমি অফিসে তো টেলিফোন করেছি, অসীম জানায়।

হ্যাঁ করেছেন, কিন্তু কবে? কতোদিন পরে? এ্যাঁ?

অসীম আর মুখ খোলে না। সে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে নীপার দিকে। তার মনে হয়, নীপার মন আর মেজাজ বোধহয় এমনিতেই আজ খারাপ- অফিসে হয়তো কোনো ঝামেলা টামেলা হয়েছে- সে মুখ বুজে আর চোখ মেলে একই ভাবে বসে থাকে। অপেক্ষা করে। কতোক্ষণে নীপার মন মেজাজ একটু ঠান্ডা আর শান্ত হয়।

কই, কী হলো? নীপা আবার অসীমের মুখের দিকে তাকায়। বলে, বলবেন না, কেন এসেছেন?

বাহ্ বললাম তো এক্ষুণি যে, দেখা করতে এসেছি, কেমন আছেন, নতুন কোনো কাজ ধরেছেন কি না- এই সব জানতে আর কি?

কেন এসেছেন দেখা করতে সেটা আমি জানি, নীপার গলার স্বর ঝাঁঝালো হয়ে ওঠে। বলে, মিষ্টি মিষ্টি কথা বলবেন, আর মন ভোলাবেন, তাই না? মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে খুব ভালো লাগে ঠিক না?

অসীম দুই চোখ কপালে তুলে বলে, আপনি এসব কী বলছেন? মনে হচ্ছে আপনার মন মেজাজ ভালো নেই, আজ তাহলে-

শেষ শব্দটা উচ্চারণ করার আগেই অসীম উঠে দাঁড়িয়েছিলো। নীপা তার হাত ধরে টেনে বসিয়ে দেয়। বলে, আমাকে আপনার ভালো লাগে তাই না?

অসীম এবার হাসে। বলে, আপনি এসব কী বলছেন? কথাটা কি মুখ দিয়ে উচ্চারণ করে বলতে হবে?

হ্যাঁ, বলতে হবে, নীপা সরাসরি চোখে চোখে তাকিয়ে বলে, আমার বিয়ের প্রস্তাব এসেছে।

ও, তাই বুঝি। তা কথাবার্তা পাকা হয়ে গেছে?

না হয়নি, নীপা জানায়। বলে, আমার বাবা বলে দিয়েছেন, আমার পরীক্ষা শেষ হবার আগে বিয়ের কথা হবে না।

হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন উনি, সামনে ফাইনাল পরীক্ষা, এখন কেন ওসব প্রস্তাব আসবে।

নীপার মেজাজ আবার তিরিক্ষি হয়ে ওঠে। গায়ে রীতিমতো জ্বালা ধরে। বলে, এখন হোক, কি তখন হোক, তোমার এখানে কিছু বলার নেই।

নীপার তুমি সম্বোধন অসীমকে একটু নাড়া দেয় সম্ভবত। সে বলে, দেখুন, আপনার বাবা আছেন, তিনি কী বলবেন না বলবেন জানি না, আর আপনি কি আমার কথা শুনবেন? তাই আমি-

বলে দেখেছো কখনো? তুমি পুরুষ মানুষ নও বুঝলে? তুমি কাপুরুষ, তোমরা সবাই কাপুরুষ। তোমাদের গোটা জেনারেশন তাই- নিজের মনের সত্যকে প্রকাশ করতে ভয় পাও, সত্যের পক্ষে দাঁড়াতে ভয় পাও। অন্যায়ের কাছে মাথা নত করে থাকো সব সময়- দাবি নেই, প্রতিরোধ নেই, প্রতিশোধ নেই, তোমরা মৃত-

আমি কি তাহলে বলবো? অসীম বলে, প্রস্তাবটা দেবো আপনার বাবার কাছে?

কী বলবে? কিসের প্রস্তাব?

না মানে, আমি আপনাকে বিয়ে করতে চাই, সেই প্রস্তাবটা- অসীম আমতা আমতা করে।

তার ভাবভঙ্গী দেখে নীপা হাসবে না কাদবে বুঝতে পারে না। বলে, আগে বাবাকে কেন বলবে? জানো না, ছেলেরাই মেয়েদের প্রথমে ভালোবাসা জানায়।

হ্যাঁ, তা জানি, অসীম বলে, কিন্তু সময় সুযোগ তো পাইনি- দু'জনে যখনই কথা বলেছি, তখনই তো শুধু একাডেমিক কথা হয়েছে, পারসোনাল কথা বলার তো চান্স পাওয়া যায়নি-

ও চান্স তুমি জীবনেও পাবে না। নীপা শেষ কথা বলে দেয়, ওই কথা তুমি কখনও আমার কাছে বলতে এসো না।

বাবা শুনছিলেন কি না নীপা লক্ষ্য করেনি। অসীম ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে, ঘরের ভেতরে এসে জানতে চান, ছেলেটা চলে গেলো?

হ্যাঁ বাবা, ওর চলে যাওয়াই ভালো, আস্ত একটা ইডিয়ট!

মেয়ের মেজাজ দেখে ইমরান কিছু বলেন না। চুপচাপ বারান্দার চেয়ারে গিয়ে বসেন। তাঁর মনে হয়, মেয়ে একটা মানসিক অস্থিরতার মধ্যে পড়তে চলেছে। সামনে পরীক্ষা, এখন এরকম ঘটনা ঘটলে পরীক্ষায় ভালো কীভাবে করবে? তিনি ঠিক করেন, আজফারের পক্ষ থেকে লোক আসুক বা অসীমের পক্ষ থেকে তিনি কাউকে বাড়িতে ঢুকতে দেবেন না। ওরা নিজেরা এলেও না।

কিন্তু বাড়িতে ঢুকতে না দিলে কী হবে, অফিসের দরজা তো খোলা। তাছাড়া সপ্তাহে একদিন দু'দিন তো কলেজে যেতেই হয়- তখন কি আর দেখা করতে পারবে না? ইমরান সাহেব শেষ পর্যন্ত বাড়ির দরজা বন্ধ রাখার চিন্তাটা বাদ দেন। মেয়েকে বলেন, পরীক্ষার জন্য অফিস থেকে ছুটি নিতে। নীপা বাবার কথা শুনলো। ছুটি নেয়ার কথা আগেই জানানো হয়েছিলো- ছুটি পেতে তাই কোনো অসুবিধাই হলো না।

আর ঐ ছুটি নিয়ে যখন পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছে মেয়ে, তখনই একদিন আজফারের ফুপু এস হাজির হলেন। কী ব্যাপার? না তিনি নীপার সঙ্গে দুটো কথা বলবেন। ইমরান সাহেব মহিলাকে বুঝিয়ে বলতে শুরু করেছিলেন, কেন তিনি চান না যে মেয়ে অন্য কারুর সঙ্গে কথা বলুক। তাঁর কথা আরম্ভ করেছেন ঐ সময় নীপা এসে সামনে দাঁড়ায় আর বলে, বাবা তুমি ঘরে যাও। আমি কথা বলছি ওঁর সঙ্গে।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই মহিলা বলেন, দেখো মা, আজফার তো ফিরে এসেছে, কিন্তু তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারছে না, অথচ তোমার সঙ্গে দেখা করা ওর খুবই দরকার। তোমাদের কলেজে গেছে, অফিসে গেছে। বহুবার ফোন করেছে কিন্তু তবু তোমাকে পায়নি, তোমাদের বাসায় আসতে চাইছিলো। আমিই নিষেধ করলাম। তা তুমি কি একবার ওর সঙ্গে দেখা করবে?

নীপা মহিলার পুরো কথা শোনে, তারপর বলে, এ ব্যাপারে আপনি বাবার সঙ্গে কথা বলুন, প্লিজ।

কিন্তু উনি তো কারও সঙ্গে তোমার দেখা হোক, তা চান না।

তাহলে, আমিও তা চাই না, নীপা মহিলার চোখে চোখে তাকিয়ে কথাটা বলে। তারপর প্রশ্ন করে, আর কিছু বলবেন?

নীপার নিজের কাছেই অবাক লাগে, অমন একজন বয়স্কা ভদ্রমহিলার সঙ্গে অমনভাবে কথা বলতে পারছে কেমন করে।

মহিলা কিছু না বলে মুখ কালো করে চলে গেলেন।

নীপার খারাপ লাগে ওভাবে মহিলাটির চলে যাওয়া দেখে। খারাপ লাগে এজন্য যে মহিলাকে তো সে নিজেই আঘাত করেছে, অপমানও করেছে- এমন করলে কি তার পক্ষে পরীক্ষার পড়ায় মনোযোগ দেয়া সম্ভব হবে? সে বাবার কাছে নিজের মনের অবস্থাটা খুলে বলে। শেষে বলে, তুমি একটা

ডিসিশন নিয়ে ওদের জানিয়ে দাও- হ্যাঁ কিংবা না।

ইমরান মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসেন। অনীতার কথা মনে পড়ে তার সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হয়নি, কিন্তু মেয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। বলেন, আজফারদের অবস্থাটবস্থা তো বেশ ভালো মনে হচ্ছে- ওদেরকে বলবো?

মেয়ে কিছু বলে না।

নাকি অসীমকে আসতে বলবো- ওকে আমার বেশ লাগে, নরম টাইপের ছেলে।

হ্যাঁ, কাপুরুষ আর ইডিয়ট, নীপা নিচু গলায় মন্তব্য করে।

তাহলে ওকে বাদ দিই, আজফারই ঠিক, কী বলো?

আমি তো বললাম বাবা, ডিসিশনটা তুমি নেবে।

তুমি কি বিয়ের জন্য মনের দিক থেকে তৈরি?

হ্যাঁ তৈরি। নীপা জানায়।

পরীক্ষা দেবে না?

হ্যাঁ দেবো, নীপার নির্বিকার উত্তর।

যদি রেজাল্ট খারাপ হয়?

হলে হবে। এবারও একই ভঙ্গিতে উত্তর দেয় নীপা।

তখন ইমরান হাসান মেয়ের হাত ধরে নিজের কামরায় নিয়ে আসেন। তারপর আলমারি খুলে দু'খানা বালা বের করেন। বলেন, এ বালা দু'খানা কার চিনতে পারো?

নীপা মাথা নাড়ায়। বলে, না , কখনো দেখেছি বলে মনে পড়ে না। আমার মায়ের? তুমি দিয়েছিলে?

ইমরান হাসান মাথা দোলান, হ্যাঁ, তোমার মায়ের। কিন্তু আমি কিনে দিইনি। নীপার স্মৃতিলোক তোলপাড় করে ওঠে- তাহলে স্বাতীর মায়ের কাছে যে কথাটা শুনেছিলেন, সেটাই কি সত্যি? যে মায়ের আরও একবার বিয়ে হয়েছিলো?

সে কোনো কথা বলে না। মুখ নিচু করে থাকে।

তোমার মাকে অ্যাম্বুলেন্সে করে নিয়ে যাবার সময় কী বলেছিলেন তোমার মা মনে নেই?

নীপা মাথা হেলায়, মুখে কিছু বলে না। কেন বলবে, ঐ স্মৃতি কি মুখে বলে বেড়াবার স্মৃতি?

মনে আছে, মা বলেছিলেন আগে এমএ পাস করতে হবে। তারপর বিয়ে-

মনে নেই-

হ্যাঁ বাবা, মনে আছে, নীপা খুব মৃদুস্বরে বলে।

আরও একটা কথা বলেছিলেন, মনে পড়ে? বলেছিলেন মেয়ের পছন্দ করা ছেলের সঙ্গে বিয়ে যেন দিই, মনে পড়ে?

হ্যাঁ, নীপা আবার মাথা দোলায়।

আরও একটা কথা বলেছিলেন, সেটা কি স্মরণ হয়?

নীপা এবার বাবার মুখের দিকে তাকায়। বলে, আর একটা কোন কথা বাবা? আমি তখন বুঝতে পারিনি।

তখন বোঝার মতো বয়স হয়নি তোমার, ইমরান জানান। বলেন, ব্যাপারটা আমাদের দু'জনের সম্পর্কে। তুমি তো শুনেছো আমার পা খানা কীভাবে নষ্ট হয়েছে, শোনোনি? তোমার মা বলেননি?

হ্যাঁ, বলেছেন। নীপা বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, তুমি বিপ্লবী রাজনীতি করতে। আন্ডারগ্রাউন্ড পার্টির মেম্বার ছিলে, পুলিশের সঙ্গে গোলাগুলি হয় আর তাতে-

হ্যাঁ, কিন্তু তোমার মাও যে ঐরকম পার্টির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন, তা বলেননি?

নীপা মাথা নাড়ায়। বলে, না তা বলেন নি-

ইমরান হাসান তখন এক এক করে সব কথা বলে যান মেয়ের কাছে। বলেন, কলেজ ছাত্রী তার মায়ের প্রেম হওয়ার কথা, একজন বিপ্লবী তরুণকে মা-বাবার অমতে বিয়ে করার কথা। তারপর ঢাকায় চলে আসার কথা। বন্ধুর বাড়িতে আশ্রয় নেয়ার কথা- তারপর মায়ের প্রথম স্বামী হারাবার ঘটনা- সব বলে যান কোনো রকম সংকোচ করেন না। এমন কি গ্রাম থেকে ঢাকা ফেরার পথে চারজন লোক যে তার মাকে ধর্ষণ করেছিলো সেই ঘটনার কথাও বাদ রাখেন না। শেষে তিনি নিজে বিয়ের প্রস্তাব দিলে রাজি হননি তাও জানিয়ে দেন। শেষে একরকম জোর করেই যে তাকে বিয়ে করেছেন কোর্টে- সেটাও বলতে বাকি রাখেন না- শেষেরও শেষে যে মুসলমান হয়েছেন অনীতা তাও থাকে তাঁর ঘটনার বর্ণনায়।

বলা শেষ হলে দেখেন, মেয়ে তাঁর মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। পাথরের মূর্তির মতো স্থির। নিঃশ্বাস পড়ছে কি না, তাও বোঝা যায় না।

হ্যাঁ, একটা কথা বলা হয়নি, ইমরান পরিবেশটা হালকা করার জন্য বলেন, আর সেটা হলো তোমার মায়ের নাম। বাবা মা'র দেয়া আর সার্টিফিকেটের নাম ছিলো পূর্ণিমা সেন। অরবিন্দ সরকারকে বিয়ে করার পর হন পূর্ণিমা সরকার, কিন্তু তখনই, মানে বিয়ে করার পরই বাবার বাড়ির সবকিছু ত্যাগ করেন তোমার মা। সেই সঙ্গে নামটাও। তার নাম নেন অনীতা। যার মানে কেউ তাকে নীত করেনি। অর্থাৎ আনেনি- সে নিজে এসেছে, তার ইচ্ছাতে, তার শক্তিতে, তার অধিকারে। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার অর্থই বোঝায় নামটা- সেই জন্যই বোধহয় মরার আগের মুহূর্তে তোমার ব্যাপারে ঐ কথা বলেছিলেন যে, এমএ পাস না করা পর্যন্ত যেন তোমার বিয়ে না দেয়া হয়।

নীপা অনেকক্ষণ ঘোরের মধ্যে থাকে- নিজের অস্তিত্বের উপলব্ধিটা ভেতরে ভেতরে একেবারে বদলে যেতে থাকে। খালি কাঁদতে ইচ্ছে করে, কখনো দুঃখে, কখনো বেদনায়, কখনো আনন্দে। যখন কল্পনা করে পূর্ণিমা সেন আর অরবিন্দ সরকার শহর ছেড়ে পালাচ্ছে গ্রামের দিকে, কি মন্দিরের পুরুত ঠাকুরের কাছে মন্ত্র পড়ে বিয়ে করছে, তখন আনন্দে মন ভরে উঠছে। আবার যখন কল্পনা করছে, বিয়ের পর তরুণ তরুণী স্বামী স্ত্রী পুলিশের তাড়া খেয়ে আশ্রয়ের জন্য গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছে তখন মায়া জেগে উঠছে মনে। কিংবা যখন কল্পনায় দেখছে নিখোঁজ স্বামীর খোঁজে ছুটতে ছুটতে গ্রামে যাচ্ছে অনীতা সরকার- তারপর গ্রাম থেকে ফেরার পথে চার চারজন পশুমানব তাকে ধর্ষণ করছে তখন রাগে ক্ষোভে অপমানবোধে চিৎকার করে উঠতে চাইতে তার সমস্ত অস্তিত্ব। তারপর যখন মা বিয়ে করছেন বাবাকে তখন শান্তিতে তৃপ্তিতে মন ভরে যাচ্ছে। তার মন যে উপলব্ধিতে পৌঁছোচ্ছে, সেটা বিজয়ের উপলব্ধি, আনন্দের উপলব্ধি। মনে হচ্ছে ধর্ষিতা মা হেরে যাননি, শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছেন, আর বাবাও পঙ্গু নন, প্রতিবন্ধী নন, একজন সফল আর শক্তিমান পুরুষ।

পরদিন সকালে ইমরান হাসানের ঘুম ভাঙে গানের কলি শুনে। বারান্দায় রেলিংয়ের ওপর ঝুঁকে নীপা গাইছে, 'মাকে আমার পড়ে না মনে।' বিছানা থেকে উঠে তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালে মেয়ে গান থামিয়ে হাসে। বলে, আজ রাতে আমি অনেক পড়েছি বাবা, দেখো এবার পরীক্ষায় ভালো করবো।

ইমরান হাসান একটু অবাক হন। মেয়ের চেহারায় ভারি স্নিগ্ধতা, গলার স্বরও কিছুটা যেন উচ্ছল।

আজ কি বাইরে কোথাও যাবি? ইমরান জিজ্ঞেস করেন।

হ্যাঁ ভাবছি, নীপা জানায়। বলে, আজফারের বাড়ির লোকেরা দূর থেকে খালি খালি বাড়িতে আসে বিয়ের কথা নিয়ে আলাপ করার জন্য। ভাবছি আজ আজফারের সঙ্গে দেখা করে জানিয়ে দেবো, আমাদের কাছে আসার দরকার নেই, যখন সময় হবে আর দরকার বোধ করবো, তখন আমিই ওর কাছে চলে যাবো।

একটু থেমে আবার বলে নীপা, হ্যাঁ অসীমকেও কথাটা বলা দরকার। কিন্তু ওতো থাকে ময়মনসিং-

কয়েক মুহূর্ত বোধহয় চিন্তা করে মেয়ে। তারপর বলে, দেখি কী করা যায়। সে ঘরে পা রেখেছে ঐ সময় শোনে বাবা বলছেন, ওদের কাছে যাওয়ার কী দরকার। ওরা যখন আসবে তখন জানিয়ে দিলেই তো হবে।

ঘরের ভেতর থেকেই নীপা বলে, হ্যাঁ, তাই দেবো।

অলংকরণ : **ধ্রুব এষ**